KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ১৬ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
Collection : KLMLGK	Publisher : বিমল মুখোপাধ্যায়
Title : পত্রিকা	Size : 6" x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5-6	Year of Publication : ভাদ্র, ১৩৪৫ আশ্বিন, ১৩৪৫ কার্তিক, ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ পৌষ-মাঘ, ১৩৪৫
	Condition : Brittle / Good
Editor : বিমল মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ময় রায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম বর্ষ, পত্রিকা অগ্রহায়ণ
চতুর্থ সংখ্যা সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র ১৩৪৬

আইনষ্টাইন ও আপেক্ষিকতাবাদ

সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বছর পয়ত্রিশেক পূর্ব্বে (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে) যখন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ প্রথম প্রচারিত হয় তখন সমগ্র পৃথিবীতে এক ডজনের অধিক ব্যক্তি নাকি তার মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারেননি। কথাটা অদ্ভুত শোনালেও একেবারে ভিত্তিহীন নয়। এর কারণ অবশ্য এই নয় যে, পৃথিবী হ'তে তখন সহসা পাণ্ডিত্যের অন্তর্দ্ধান হয়েছিল। প্রকৃত কারণ এই যে, আপেক্ষিকতাবাদকে যুক্তি ও প্রমাণের উপর দাঁড় করাতে গিয়ে আইনষ্টাইনকে এমন সব hypothesis বা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল যা' মানুষের চিরপুরাতন এবং এমন কি স্বতঃসিদ্ধরূপে গৃহীত বহু সংস্কারকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়েছিল। প্রথমেই প্রয়োজন হয়েছিল "কালোহ্যয়ং নিরবধি" "বিপুলাচ পৃথ্বী" এই সব চিরপোষিত সংস্কারকে,—যা'দের ধ্রুবসত্যরূপে অবলম্বন ক'রেই মানুষের চিন্তাস্রোত এ যাবত প্রবাহিত হচ্ছিল,—ত্যাগ করা, অথবা অন্ততঃ খাঁটি সত্যরূপে গ্রহণ না করা। কালের নিত্যতা, পারম্পর্য্য ও পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার এতই দৃঢ় যে, সুরুতে দশ বিশ জনের অধিক ব্যক্তি তা' কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আজও শত করা পঁচানব্বই জনই তা' পারেন না এবং আমরা, বাঙালীরা, সম্ভবত হাজার করা নয় শত নিরানব্বই জনই তা' পারি না। তাই আপেক্ষিকতাবাদ সুরুতেই এসেছিল দুর্ব্বোধ্যতার ছাপ নিয়ে, আর আজ পর্য্যন্তও ঐ ছাপ বড় বেশি মুছবার অবকাশ পায় নি।

বাস্তবিক, আপেক্ষিকতাবাদকে মানুষের সহজ যুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সত্য বলে' উপলব্ধি করতে হ'লে প্রথমেই দেশ ও কাল রূপ প্রকাণ্ড দৈত্য দু'টিকে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে হয়। প্রথমেই মেনে নিতে হয়, কাল বলে' স্বয়ংসিদ্ধ কোন পদার্থ নেই, সকলের দেশ বলে' বিশিষ্ট কোন দেশও নেই। দেশ বা কাল নেই এমন কথা অবশ্য আপেক্ষিকতাবাদ প্রথমেই বলেনি; বলেছিল,—ওরা আপেক্ষিক, ওদের খাঁটি সত্তা বা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ সত্তা নেই; আছে শুধু আপেক্ষিক সত্তা, যা' দ্রষ্টাভেদে বদ্‌লে যেতে পারে ও যায়, যা' তোমার আমার পরিমাপে একই মূল্য-জ্ঞাপন করে কেবল আমরা পরস্পর সম্পর্কে বেগহীন বলে'—একই পৃথিবীর অধিবাসী বলে'; কিন্তু যা' মঙ্গলগ্রহের দ্রষ্টাগণের পক্ষে কথঞ্চিৎ ভিন্ন, পৃথিবী সম্পর্কে ঐ গ্রহের আপেক্ষিক বেগের

জন্যই এবং যা, সূর্য্যের এবং অন্যান্য নক্ষত্রের দ্রষ্টাগণের পক্ষে, ওদের বৃহত্তর আপেক্ষিক বেগের জন্য, অধিকতর পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন।

দেশ ও কালের, এমন কি জড় ও জড়-শক্তিরও যা' কিছু অস্তিত্ব তা' গড়ে' তুলেছি আমরা,—পরস্পর সম্পর্কে বিভিন্ন বেগে ধাবমান, বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টাগণ—পৃথিবী, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদির অধিবাসিগণ। গড়ে' তুলেছি আমাদের চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এবং হাতঘড়ি ও ফুটরুলের সাহায্যে ওদের সম্পর্কে পরিমাপ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে'। যাঁরা ঐ ঢাল ও ঐ তলোয়ারকে আয়ুধরূপে গ্রহণ করে' প্রকৃতির রাজ্য জয় করতে অগ্রসর হয়েছেন প্রকৃতি মাতার সুসন্তান বলে' দাবী করবার অধিকার রয়েছে শুধু তাঁদেরই। দ্রষ্টা বলতে প্রকৃতপক্ষে তাঁদেরই বোঝায়, এবং দেশ, কাল, জড় বা শক্তি সম্বন্ধে খাঁটি মত প্রকাশ করবার ক্ষমতা রয়েছেও শুধু তাঁদেরই। তাঁদের দল থেকে তুমি আমি বহু দূরে সরে' পড়ে' আছি এবং এমন কি অনেক বড়-বড় পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও সরে' পড়ে' ছিলেন এবং এখনও আছেন, কেবল কল্পনার উপর বাস্তব জগতের কাঠামো গড়ে' তুলবার বৃথা প্রয়াসের অপরাধে। প্রাচ্য দর্শনও দূরে সরে' রয়েছে কিনা সে-সম্বন্ধে মত প্রকাশের সময় এখনো আসে নি। হয়ত সম্পূর্ণ সরে' নেই, কিন্তু এখনও ঠিক বলা যায় না।

কেবল সৃষ্টি ক'রেই ক্ষান্ত হই নি, কালের ব্যবধানে ও পদার্থের দৈর্ঘ্যে, পরিমাণের ছাপও মেরে দিচ্ছি আমরাই; এবং দিচ্ছি আমাদের বিভিন্ন জগতের আপেক্ষিক বেগকে ভিত্তি করে'। যতক্ষণ আমরা পরস্পর সম্পর্কে স্থির থাকি, যতক্ষণ আমাদের আপেক্ষিক বেগটা থাকে শূন্য পরিমিত, ততক্ষণ আমাদের দেশ-বুদ্ধিতে ও কাল-বুদ্ধিতে কোন বৈষম্যের সৃষ্টি হয় না, এদের পরিমাপের ফলও সকলের কাছে একই দাঁড়ায়। যেই আমরা পরস্পর সম্পর্কে বেগবিশিষ্ট হই অমনি আমাদের দেশ ও কাল, আমাদের জগদ্দর্শন-প্রণালী, আলাদা হয়ে দাঁড়ায়—ঘটনায় ঘটনায় দেশের ব্যবধান বা কালের ব্যবধান মেপে আমরা পরস্পরের সঙ্গে আর একমত হ'তে পারি না। তুমি ও আমি, অথবা তোমার জগৎ ও আমার জগৎ, পরস্পর সম্পর্কে স্থির অবস্থায় থাকলে প্রত্যেকেই আমরা দেখতে পাই যে, তোমার 'ফুট' ও আমার 'ফুট' এবং তোমার 'সেকেণ্ড' ও আমার 'সেকেণ্ড' অবিকল সমান। দেখতে পাই যে, আমাদের প্রত্যেকের ফুটরুল অপরের ফুটরুলের (ও ঘড়ির) পরিমাপে অবিকল একফুট, এবং প্রত্যেকের ঘড়ির পরপর দুটি টিক্‌টিক্ ধ্বনির অন্তর্গত কালের ব্যবধানটা অপরের ঘড়ির কাঁটার (ও ফুটরুলের) পরিমাপেও অবিকল এক সেকেণ্ড। কিন্তু যেই আমরা পরস্পর সম্পর্কে বেগবিশিষ্ট হই অমনি প্রত্যেকের ফুটরুল অপরের পরিমাপে একফুট অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খাটো এবং প্রত্যেকের ঘড়ির টিক্‌টিকের ব্যবধান অপরের পরিমাপে কিঞ্চিৎ দীর্ঘতর হয়, এবং হয় একটা বিশিষ্ট অনুপাতে, যে-অনুপাতের মাত্রা নির্ভর করে শুধু আমাদের আপেক্ষিক বেগের উপর এবং মহাশূন্যে আলোকের বেগের উপর,—যা' আমাদের আপেক্ষিক বেগ সত্ত্বেও সকলের কাছে একই মূল্য জ্ঞাপন করে' থাকে। আমাদের আপেক্ষিক বেগের মাত্রা যতই বাড়তে থাকে দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে উক্ত সঙ্কোচন

এবং কাল সম্বন্ধে উক্ত প্রসারণও ততই বাড়তে থাকে এবং ঐ বেগটা যদি আলোকের বেগের সমান হয়ে দাঁড়াতে পারতো—যার সম্ভাবনা, বলতে গেলে, একেবারেই নেই—তবে আমাদের প্রত্যেকের ফুটরুলের দৈর্ঘ্য অপরের পরিমাপে শূন্য পরিমিত এবং প্রত্যেকের ঘড়ির সেকেণ্ড বা টিকটিক শব্দের ব্যবধান অপরের পরিমাপে অনন্তকালরূপে ধরা পড়্‌তো।

আপেক্ষিকতাবাদের বিচার প্রণালী হ'তে এ কথাও স্পষ্ট ধরা পড়লো যে, দেশ ও কালের ধারণাও পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়। পদার্থ বিশেষের দৈর্ঘ্য মাপতে গিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে কালের পরিমাপের এবং এক জোড়া ঘটনার অন্তর্গত কালের ব্যবধান মাপতে গিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে দেশের ব্যবধান মাপবারও প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ তোমার ও আমার জগৎ পরস্পর সম্পর্কে স্থির থাকে ততক্ষণ উভয় জগতই আমাদের উভয়ের পক্ষে সাধারণ জগৎরূপে প্রতিপন্ন হ'তে থাকে; আমাদের দেশ ও কালও উভয়ের পক্ষে সাধারণ দেশ ও সাধারণ কালরূপে পরিচয় প্রদান করে। পরস্পর সম্পর্কে আমরা বেগবিশিষ্ট হ'লেই তোমার জগৎকে আমার এবং আমার জগৎকে তোমার বলবার অধিকার লোপ পায়। তখন ঘটনাময় জগতের দিকে তাকিয়ে যে ঘটনা-জোড়ার অন্তর্গত দূরত্ব ও কালের ব্যবধানকে তুমি নির্দ্দেশ কর 'দ' ও 'ক' দ্বারা তা'রা আমার পরিমাপে ধরা দেয় 'দা' ও 'কা' রূপে,—যার প্রত্যেকটারই একটা পরিমাণগত সম্পর্ক রয়েছে তোমার 'দ' ও 'ক' এই উভয়েরই সঙ্গে। আমার দেশ-বুদ্ধি কাল-বুদ্ধি দ্বারা এবং কাল-বুদ্ধি দেশ-বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত এবং উভয় বুদ্ধিই মুখ চেয়ে চলছে তোমার দেশ ও কাল-বুদ্ধির। তোমার আমার সঙ্গে এই সম্বন্ধ, এই মুখ চাওয়া-চাওয়ি ব্যাপার। সম্বন্ধ বিধিলিপি, এর ওপর তোমার আমার কোন হাত নেই। আমাদের হাত আছে শুধু পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে' বিচার-শক্তি প্রয়োগ করে' ঐ সম্বন্ধের আকার আবিষ্কার করা। আপেক্ষিক বেগসম্পন্ন বিভিন্ন দ্রষ্টার দেশ ও কালের সম্বন্ধটা আবিষ্কার করেছিলেন লোরেঞ্জ,—আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রচারিত হবার পূর্ব্বেই। এ জন্য তা' লোরেঞ্জ-সূত্র নামে পরিচিত; কিন্তু সূত্রটার প্রকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন আইন্‌ষ্টাইন এবং এ জন্য তাঁকে অপরিমিত সাহস সঞ্চয় ক'রেই বলতে হয়েছিল "প্রকৃতির রাজ্যে যত দ্রষ্টা তত দেশ, এবং যত দেশ তত কাল।"

এইরূপে দেশ ও কাল তাদের নিরপেক্ষ সত্তা হারিয়ে আপেক্ষিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইরূপে জড় ও শক্তিরও আপেক্ষিকতা প্রতিপন্ন হয়েছে। যে ঢিলটার বস্তু মেপে পরিমাণ নির্দ্দেশ করছি আমি এক গ্রাম বা এক পাউণ্ড, তা' যদি আমার সম্পর্কে বেগসম্পন্ন হয় তবে তার বস্তু মেপে পাবো আমি এক গ্রাম বা এক পাউণ্ডের চেয়ে কিছু বেশী। ঐ বেগ যত বাড়তে থাকবে আমার কাছে ঢিলটার বস্তুও তত বাড়তে থাকবে এবং শেষপর্য্যন্ত ঐ বেগটা যদি বৃহত্তম বা আলোকের বেগের সমান হ'য়ে দাঁড়ায় (আপেক্ষিকতাবাদের মতে কোন জড়দ্রব্যের বেগই আলোকের বেগকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না) তবে ঢিলটার বস্তুমান আমার মাপে দাঁড়াবে অসীম। আবার জড়দ্রব্যের মত, জড়ের শক্তিও আপেক্ষিক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, এটাও প্রতিপন্ন হয়েছে যে জড় ও শক্তির মূল উপাদান ভিন্ন নয়,—একটা অপরটার মূর্ত্তিভেদ মাত্র, যেমন দেবেন্দ্র দত্ত ও হরিদাসী বৈষ্ণবী। বৈজ্ঞানিকেরা এখন বলতে আরম্ভ করেছেন, জড়ও অবিনশ্বর নয়; বড় জোর বলা

যেতে পারে, জগতে জড় ও শক্তির মোট পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি নেই।

কিন্তু, দেশ, কাল, জড় প্রভৃতির আপেক্ষিকতা প্রতিপাদনই আপেক্ষিকতাবাদের লক্ষ্যের বিষয় নয়। ভাঙবার প্রবৃত্তি নিয়ে আইন্‌ষ্টাইন আপেক্ষিকতাবাদ প্রচার করেন নি,—প্রচার করেছেন গড়বার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই, এবং তাতে সফলতাও লাভ করেছেন।

সেই গঠন কার্য্য কি? সেই গঠন কার্য্য, জড়জগতে খাঁটি বা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ সত্যের আবিষ্কার—এমন সব সত্য যার মূর্ত্তি দ্রষ্টাভেদে এবং তাদের জগৎ-ভেদে, ঐ সকল জগতের আপেক্ষিক বেগ সত্ত্বেও মোটেই বদলায় না। ওদের মধ্যে আবার যে সব সত্য জাগতিক ঘটনাবলীর মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে, বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তারাই। এদের অপর নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

সহজে ও সংক্ষেপে এদের প্রকাশ করা যায় সূত্র বা formula দ্বারা। তোমার সূত্রের ভিতর থাকে 'দ' ও 'ক'—দেশ ও কাল সম্পর্কে তোমার পরিমাপের ফল এবং আমার সূত্র রচিত হয় 'দা' ও 'কা'-কে অবলম্বন করে', যা' ঐ ঘটনা সম্পর্কে আমার দেশ ও কালের পরিমাপের ফল নির্দ্দেশ করে। উভয় ক্ষেত্রেই সূত্ররচনায় +, — প্রভৃতি সম্বন্ধসূচক চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। যদি উভয়ের সূত্রে একই চিহ্নসমূহ একই ভাবে সজ্জিত হয়, তবে, দেশের ও কালের পরিমাপের ফল তোমার আমার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হ'লেও, ঐ প্রাকৃতিক নিয়মটি উভয়ের কাছে একই আকার ধারণ করছে বলে' বুঝতে হবে।

বৈজ্ঞানিকগণ এ যাবত বলে' আসছিলেন 'ক' ও 'কা' পরস্পরের সমান হতেই হবে এবং স্থলবিশেষে 'দ' ও 'দা-ও সমান হয়ে থাকে। আইন্‌ষ্টাইন বল্লেন, "না, তা' হ'তে পারে না, হবার প্রয়োজনও নেই। আপেক্ষিক বেগের জন্য আমাদের দেশ ও কাল অসমান হ'তে বাধ্য, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? দেশ বা কাল আমাদের কি এমন আপন যে ওদের পরিমাণ বদ্‌লে গেল বলে' হা-হুতাশ করতে হবে? খাঁটি সত্য আমাদের সকলের কাছেই ঐ প্রাকৃতিক নিয়মগুলি, যা' আমাদেরকে প্রকৃতি মাতার অন্তরের খবর দান করে। যদি ঐ সকল সত্য তোমার আমার কাছে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে উপস্থিত হ'তে থাকে, যদি দ্রষ্টাভেদে, প্রাকৃতিক নিয়মের আকার বদ্‌লে যায়, যদি তোমার 'দ' ও 'ক' পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে আমার 'দা' ও 'কা' তা' না করে, তবেই আমাদের আফ্‌শোষ করবার কারণ উপস্থিত হয় যে, মাতৃস্নেহের নিরপেক্ষতা হ'তে আমরা বঞ্চিত হয়েছি এবং হয়েছি আমরা পরস্পর সম্পর্কে বেগসম্পন্ন কেবল এই অপরাধে। কিন্তু ভয় নেই, জগতে এমন সব নিয়ম রয়েছে যা' আমাদের আপেক্ষিক বেগ সত্ত্বেও সকল দ্রষ্টার কাছে একই আকারে উপস্থিত হয়ে থাকে। ঐ সকল নিয়মই খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম, এবং ঐ সকলকে অবলম্বন ক'রেই বিভিন্ন জগতের অধিবাসী আমরা ভাই-ভাই।"

সেই সব খাঁটি নিয়ম কি, যা' আপেক্ষিক বেগ সত্ত্বেও বিভিন্ন দ্রষ্টার পরিমাপে একই আকারে উপস্থিত হয়ে থাকে? আইন্‌ষ্টাইন বল্লেন, আলোকের বেগের দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা এইরূপ একটি খাঁটি নিয়ম বা খাঁটি সত্য। আমরা পরস্পর সম্পর্কে যত বেগেই ছুটোছুটি করি না কেন,

ঐ সব বেগ যদি সমবেগ হয়, তবে দেখতে পাবো যে, আলোকের বেগ মাপতে গিয়ে আমরা যে সকল দূরত্বের ('দ', 'দা' প্রভৃতির) এবং যে সকল কালের ব্যবধানের ('ক' 'কা' প্রভৃতির) সাক্ষাৎ পাই তা' দ্রষ্টাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হ'লেও 'দ' ও 'ক'-এর অনুপাত এবং 'দা' ও 'কা'-এর অনুপাত পরস্পরে সমান, বা একটা নির্দ্দিষ্ট রাশি। আইন্‌ষ্টাইনের এই উক্তিকে—আলোকের বেগের এই দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতার প্রতিজ্ঞাটিকে—বহু বৈজ্ঞানিকই প্রথমটা অসম্ভব বলে' উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ, যে আলোকরশ্মির বেগ আমার মাপে ধরা পড়ছে সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ রূপে, তোমার মাপেও যে তা' সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ হয়ে দাঁড়াবে,—যদিও তুমি আমার কাছ থেকে ছুটে চলেছ, হয়ত ঐ আলোকরশ্মির দিকেই সেকেণ্ডে দেড় লক্ষ ক্রোশ বেগে—তা' পুরাতন দেশ কালের ধারণা নিয়ে আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না। আইন্‌ষ্টাইনকে ঐ উক্তি করতে হয়েছিল, পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ নির্ণয়কল্পে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক মিকলসনের নিষ্ফল পরীক্ষার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে। ঐ পরীক্ষার বিবরণ দেওয়া এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদের গোড়াপত্তন হয়েছিল ঐ নিষ্ফল পরীক্ষাতেই।

সমবেগের জগতে আলোকের উক্ত বেগ-মাহাত্ম্যকে একটা খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মরূপে অঙ্গীকার করে' ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন্‌ষ্টাইন নিম্নোক্ত বাণী প্রচার করলেন:

যে সকল জগৎ পরস্পর সম্পর্কে সমবেগ-সম্পন্ন তাদের দ্রষ্টাগণের পরিমাপে যাবতীয় খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মই (গতি-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান, তাড়িত-বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কীয় সকল নিয়মই) একই আকারে উপস্থিত হয়ে থাকে।

আইন্‌ষ্টাইনের এই অনুমান বা hypothesisকে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ (Special theory of Relativity বলা যায়। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ বলা হয় এই জন্য যে, যে সকল জগতের পরস্পর-সম্পর্কীয় বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না, কেবল ঐ সকল জগতেই উক্ত নিয়ম খাটবে—এখানে তাই অনুমান করা হয়েছে।

এর প্রায় দশ বৎসর পরে (১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে) উক্ত নিয়মটাকে আরও ব্যাপকতা দান করে আইন্‌ষ্টাইনের নিম্নোক্ত বাণী,—যাকে বলা যায় সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ (General Theory of Relativity) প্রচার করলেন:

যে সকল জগৎ পরস্পর সম্পর্কে বিষমবেগ-সম্পন্ন তাদের দ্রষ্টাগণের পরিমাপেও (গস্ প্রবর্ত্তিত পরিমাপ-প্রণালী অবলম্বনে দেখা যাবে যে) যাবতীয় খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মই একই আকার ধারণ করে' থাকে।

গসের প্রণালীর বিশ্লেষণের এ স্থান নয়। এখানে এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, গস্ প্রবর্ত্তিত জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাগুলি ইউক্লিডের জ্যামিতি হ'তে ভিন্ন ও অধিকতর ব্যাপক।

এই প্রবন্ধে আমরা এই কথাটাই বিশেষ করে' বলতে চেয়েছি যে আপেক্ষিকতাবাদের উদ্দেশ্য ভাঙা নয়—গড়া। ঐ তত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য জগতে বৈষম্যের অন্তরালে সাম্যের

প্রতিষ্ঠা। আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন বিভিন্ন জগতের অধিবাসী হয়েও, আপেক্ষিক বেগ-জনিত আমাদের প্রকৃতিদত্ত বৈষম্যকে বিধিলিপিরূপে মেনে নিতে বাধ্য হয়েও আমরা যে ভাই-ভাই—একই প্রকৃতি মাতার সন্তান রূপে একই স্নেহ-রসে পুষ্ট—এই বোধের প্রতিষ্ঠাই এর মূল ময়। যাঁরা এই বড় কথাটাকে ছোট বলে' তুচ্ছ করেন, আপেক্ষিকতাবাদ তাঁদের কাছে দুর্ব্বোধ্যই থেকে যায়। আইন্‌ষ্টাইনের মতবাদকে আপেক্ষিকতাবাদ না বলে' হয়ত সাম্যবাদ বললেই ঠিক হ'ত,—অন্ততঃ তাতে মূল কথাগুলি ধরবার পক্ষে অনেকের সুবিধা হ'ত সন্দেহ নেই।

আইন্‌ষ্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব হ'তে আমরা সত্যের একটা সংজ্ঞা পাই। খাঁটি সত্য তাই যা বিভিন্ন অবস্থার দাস হ'লেও, সকল দ্রষ্টার কাছে একই আকারে উপস্থিত হ'য়ে থাকে। সত্যের সংজ্ঞা আর কেউ এত জোরের সঙ্গে দিতে পারেন নি। মিথ্যার জগতে সত্য মনশ্চক্ষুতে সহজে ধরা দিতে চায়না, তাই তার স্বরূপ প্রকাশ করতে হয় নেতি, নেতি করে'। তাই ভারতীয় ঋষিগণের মত সত্যদ্রষ্টা আইন্‌ষ্টাইন্‌কেও বলতে হয়েছিল, দেশ সত্য নয়, কাল সত্য নয়, জড় সত্য নয়। খাঁটি সত্য,—প্রকৃতি মাতার মর্ম্মস্থল-নিঃসৃত নির্ম্মল পীযূষধারা, যা আকণ্ঠ পান করে সমভাবে তৃপ্ত হবার তুল্য অধিকার রয়েছে তাঁর সকল সন্তানেরই।

মৃত্যু মহোৎসব

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এদিকে কলিকাতার লোক তখন ভয়ে সন্ত্রস্ত। ভয় হইবার কথাই। কারণ আজকাল আর কামান বন্দুক লইয়া সাম্‌না-সাম্‌নি যুদ্ধ বড়-একটা হয় না। যুদ্ধ হয় এরোপ্লেন হইতে বোমা ফেলিয়া। আকাশ হইতে দুম্‌দাম্ করিয়া এলোপাথাড়ি বোমা পড়িতে থাকে, বড় বড় ইমারত-অট্টালিকা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া যায়, ছেলেবুড়া সবাই মরে, নিরীহ নগরবাসী প্রাণ লইয়া সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে।

ইংরাজ জার্ম্মানীর শত্রু। আর আমরা বাস করি ইংরাজ-রাজত্বে। শত্রুকে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই। আকাশ-পথে জার্ম্মানী অনায়াসে ভারতবর্ষে উড়িয়া আসিতে পারে। সুতরাং সাবধান!

এই বলিয়া কলিকাতার খবরের কাগজগুলি প্রত্যহ বড় বড় হরপে খবর ছাপাইতে লাগিল। অতর্কিতে বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনায় শহরবাসী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

তাহার পর হঠাৎ একদিন সরকারী নোটিশ বাহির হইল—আগামীকল্য কলিকাতা শহরে বিমান-আক্রমণের মহড়া দেওয়া হইবে। বেলা এগারোটা হইতে এগারোটা পনেরো মিনিট পর্য্যন্ত রাস্তায় গাড়ীঘোড়া লোকজন কেহই চলিতে পারিবে না। ট্রাম বাস চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া যাইবে। চারিদিকে সাইরেণের আওয়াজ হইবে। ওই সময় বাড়ী হইতে কেহই বাহির হইবেন না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সংবাদ মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে হইতে শাখায় প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া কলিকাতা শহর এবং শহরতলীর নিরীহ গৃহস্থের অন্তঃপুরে নিতান্ত বিকৃতভাবে প্রবেশ করিল। অনেকে ভাবিল, এবার আর নিস্তার নাই। যুদ্ধ বাধিবার কিছুদিন আগে একবার ঘরের সমস্ত আলো নিবাইয়া দিয়া অন্ধকারে জুজুবুড়ী সাজিয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। সেবার কোনোরকমে বাঁচিয়া গেছি, কিন্তু এবার হয়ত সকলকেই মরিতে হইবে। এমনি একটা ভ্রান্ত ধারণায় সকলেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

মানুষের মরিবার আতঙ্কটা এত বেশী গড়াইল যে, সকালে সেদিন দেখা গেল, কলিকাতার অধিকাংশ হাট-বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাহিরের গ্রাম হইতে নিরক্ষর চাষী যাহারা তরিতরকারি লইয়া বাজারে আসে তাহারা ত আসিলই না, এমন-কি শিক্ষিত ভদ্রলোকের দোকানদানিও বন্ধ। রাস্তায় লোক চলাচল একরকম বন্ধ। নিতান্ত প্রয়োজনে যাহাদের বাহির হইতে হয় তাহারাও এই বলিয়া বাড়ীর মেয়েছেলেদের সান্ত্বনা দিয়া বাহির হইল যে, বেলা এগারোটার আগে তাহারা নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরিবে।

নিরীহ ভারতবাসী কলেরায় মরে, মহামারীতে মরে, জ্বরে-বিজ্বরে ধিকি ধিকি করিয়া বাঁচিয়া মরে এবং মরিয়া বাঁচে ; সুতরাং মৃত্যুর অভিজ্ঞতা যে তাহাদের নাই তাহা নয়, তাহারা জানে—মৃত্যু আসে ভগবানের হাত হইতে। তাই মানুষের হাতে এমন করিয়া বোমায় বারুদে কামানে বন্দুকে অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যুকে তাহাদের এত ভয়।

সেদিন সকালে বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিলাম, এগারোটা বাজিতে এখনও অনেক দেরি, দেখাই যাক না—কে কোথায় কি করিতেছে। আমার বুড়ী মা কোথা হইতে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া হাতখানা ধরিয়া ফেলিলেন। কিছুতেই যাইতে দিবেন না। 'না বাবা, বোমা পড়বে, যাস্ নি।'

বলিলাম, 'না মা, বোমা-টোমা পড়বে না। রাস্তায় মহড়া দেবে। কোত্থেকে কি যে সব শোনো!'

মা বলিলেন, 'ও-সব মহড়া-টহড়া বুঝিনা বাবা, আমার কথা শোন্! বাড়ীতে বসে' থাক্। মরি ত' একসঙ্গে—'

কথাটা মা শেষ করিতে পারিলেন না। মা'র মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি—নিষ্প্রভ চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

আমারও আর প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা রহিল না। চুপ করিয়া দোতলার ঘরে গিয়া বসিলাম।

মা বোধহয় খুসী হইয়া বলিলেন, 'একটু চা তৈরি করে' দিই, বসে' বসে' খা।'

বলিলাম 'দাও।'

জানলার ধারে বসিয়াছিলাম। সুমুখে ছোট একটি গলি রাস্তা। রাস্তার ওপারে বহুকালের পুরাতন একটি ব্যারাক-বাড়ীর মত লম্বালম্বি দোতলা বাড়ী। বাড়ীটি অদ্ভুত। একসঙ্গে এত বড় বাড়ী একজন লোকের পক্ষে ভাড়া লওয়া অসম্ভব, তাই বাড়ীর মালিক বাড়ীখানিকে সুকৌশলে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। কেহ-বা একখানি, কেহ-বা দুইখানি ঘর লইয়া বাস করিতেছেন। সুমুখে একফালি বারান্দা, তাহাতেই রান্না চলে। বারান্দায় কেহ-বা চট্ টাঙাইয়াছে, কেহ-বা ভাঙা পুরানো খানিকটা টিন দিয়া প্রতিবেশীর দৃষ্টি হইতে নিজেদের আড়াল করিয়াছে। এমনি করিয়া অনেকগুলি দুস্থ গৃহস্থ কতদিন ধরিয়া যে এখানে সপরিবারে পাশাপাশি বাস করিতেছে কে জানে! ভাড়া যাহারা দিতে পারে তাহারাই থাকে, যাহারা পারে না তাহাদের উঠিয়া যাইতে হয়।

সেদিক দিয়া বাড়ীর মালিক রাসবিহারী কুণ্ডুর নজর বড় তীক্ষ্ণ। লোকটাকে আমি চিনি। যেমন বড়লোক, তেমনি কৃপণ। খরচ হইবে বলিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত করে নাই। শতছিন্ন একখানি ছোট কাপড় পরিয়া, খালি পায়ে খালি গায়ে রোজ দু'বেলা তাহাকে এ-পাড়ায় আসিতে হয়। প্রত্যহ দু'বেলা অবশ্য ভাড়া আদায় করিতে আসে না। দেখিতে আসে—ভাড়া না দিয়া গোপনে কোনও ভাড়াটে' পলায়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে কি-না!

বাড়ীটার দিকে তাকাইয়া তাহারই কথা ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ দেখি—গলির মধ্যে তিনিই

প্রবেশ করিতেছেন। আমার দিকে নজর পড়িতেই কুণ্ডুমহাশয় থমকিয়া দাঁড়াইলেন, হাতজোড় করিয়া সেইখান হইতেই একটি প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'সর্ব্বাঙ্গীন কুশল?'

বলিলাম, 'হাঁ।'

এইবার তিনি যে আমাকে কি প্রশ্ন করিবেন তাহা আমি জানি। তাহারই অপেক্ষা করিতেছিলাম।

ঠিক তাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনও খবর আছে দাদা?'

বলিলাম, 'না।'

এই প্রশ্নের একটা তাৎপর্য্য আছে। আমার বাড়ীর এই জানালা হইতে ও-বাড়ীর প্রত্যেকটি বস্তু স্পষ্ট পরিস্কার দেখা যায়। তাই কুণ্ডুমহাশয়ের আদেশ—যদি কোনোদিন কোনও ভাড়াটিয়া তাঁহাকে না জানাইয়া লুকাইয়া পলাইবার বন্দোবস্ত করে ত' দয়া করিয়া তৎক্ষণাৎ আমি যেন তাঁহাকে খবরটা দিয়া আসি।

এবং শুধু এই জন্যই আমার প্রতি তাঁহার এইরকম অচলা ভক্তি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজ যে আপনি বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন কুণ্ডুমশাই?'

কুণ্ডুমশাই বলিলেন, 'প্রাণের দায়ে বেরিয়েছি দাদা।—আচ্ছা, আপনারা ত' সব খবর-টবর রাখেন, বোমা কি সত্যিই পড়বে?'

বলিলাম, 'তা পড়তে পারে।'

'কিন্তু বোমা পড়লে ত' বাড়ী ঘরদোর সব চুরমার হয়ে যাবে, না কি বলেন?'

বলিলাম, 'তা যাবে বই-কি! বাড়ী ঘর ত' যাবেই, সঙ্গে-সঙ্গে মানুষও যাবে।'

কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে দেখিলাম তাঁহার তত বেশি আগ্রহ নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা মশাই, শুনলাম নাকি বালির বস্তা ছাতে রাখলে বাড়ীঘরের ক্ষতি কিছু হয় না!'

কথাটার জবাব আর দেওয়া হইল না। সুমুখের ব্যারাক্ বাড়ীর একটা ঘর হইতে নারীকণ্ঠের কান্না শোনা গেল।

চায়ের কাপ্ হাতে লইয়া মা ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। কাপ্‌টা আমার হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে কাঁদছে? ও-ঝাড়ীর সেই বৌটি, না?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ মা, ছেলেটি মরে' গেল বোধ হয়।'

বোধ হয় নয়। একটু সরিয়া গিয়া স্পষ্টই দেখিলাম, উপরের একটি ঘরের মেঝেয় সদ্য মৃত সন্তানের বুকের উপর আছাড় খাইয়া মা তাহার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।

পাঁচদিন আগেও ছেলেটিকে রাস্তার উপর খেলা করিতে দেখিয়াছি।

মাকে বলিলাম, 'তুমি যাও মা এখান থেকে, সরো।'

মা'র চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতেছিল। চোখ মুছিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। বলিলেন, 'চা'টা খা, আমি একবার আসি ওদের বাড়ী থেকে।'

পুত্রহারা জননীর উন্মত্ত ক্রন্দন বুকে আসিয়া বিঁধিতে লাগিল। একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইয়া রহিলাম।

মেয়েটির স্বামী কাঁদিতে কাঁদিতে স্ত্রীর হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। মরা ছেলেটাকে কিছুতেই সে ছাড়িতে চায় না! স্বামী তাহার যতই বলে, 'ওকে ছেড়ে দাও! ওকে ছেড়ে দাও!' স্ত্রী তাহার উন্মাদিনীর মত তত বেশি চীৎকার করিতে থাকে: 'বোমা কখন্ পড়বে? হ্যাঁগা, এ-বাড়ীতে পড়বে ত?'

—'মেয়েটার কথা শুনেছেন মশাই?'

হঠাৎ কুতুমশাই-এর গলার আওয়াজ শুনিয়া চমকিয়া তাকাইতেই দেখি—প্রকাণ্ড একটা বাঁশের সিঁড়ি বাহিয়া তিনি তাঁহার বাড়ীটার ছাদে উঠিয়াছেন। রাস্তার উপর দুইটা গরুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর জনকয়েক কুলি অতিকষ্টে সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর বালির বস্তা তুলিতেছে।

লোকটার কথার জবাব দিলাম না। জবাব দিবার প্রবৃত্তিও হইল না। তিনি কিন্তু আপন মনেই বলিতে লাগিলেন: 'তোমাদের মাথায় বোমা পড়ুক্! আমার বাড়ীতে কেন বাবা, অন্য বাড়ীতে উঠে গেলেই ত' পারো!'

এদিকে ঠিক সেই সময়ে ছোট ছোট কয়েকটি ছেলেমেয়ে বোমা কেমন করিয়া পড়ে বোধকরি তাহাই দেখিবার জন্য হৈ হৈ করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছে। আর ওদিকে তিন চার বছরের একটি অবাধ্য ছেলেকে তাহার মা আর কিছুতেই টানিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া রাস্তায় বাহির হইবার জন্য ছেলেটা একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিয়াছে, আর আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া চীৎকার করিয়া তাহার সঙ্গীদের শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতেছে: 'ওরে, আমরা আজ মরব। আজ বোমা পড়বে।'

মা তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, 'চুপ্ কর্ দস্যি ছেলে, চুপ্ কর্!'

কিন্তু দস্যি ছেলে চুপ কিছুতেই করিতে চাহিল না। হাতটা জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া আবার সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে চেঁচাইয়া উঠিল, 'আমরা মরব, আমরা মরব!'

বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জীবন

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অল্প দিন আগে 'হরিজনে' গান্ধীজীর একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম, 'চরকার সামর্থ্য'। এই প্রবন্ধে গান্ধীজী আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানকে বিশ্বশান্তির বিঘ্ন স্বরূপ বলে' ব্যাখ্যা করেছেন এবং তারই পাল্টায় চরকার অসামান্য শক্তির দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চরকার সামর্থ্যে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু সে-সামর্থ্য কতটুকু? একটি মানুষের অবিরাম হস্ত-চালনায় একটা চরকা এক মাসে যে সুতো উৎপন্ন করে, তা কোন ক্ষুদ্রতম পরিবারেরও আচ্ছাদন সরবরাহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়, যদি না আচ্ছাদনের প্রয়োজনীয়তাকে পনেরো আনা রকম সংক্ষেপ করে' আনা হয়। এ অবস্থায় সমস্ত ভারতবর্ষ যদি চরকাসর্ব্বস্ব হয়ে গান্ধীজীর নির্দ্দেশ পালন করে, তাহ'লে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর ভাগ্যে একখানি করে' কোপ্‌নি জোগাড় হবে কিনা সন্দেহ! সুতরাং চরকার সামর্থ্য আর যাই হোক্, দেশের ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়—নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সম্বল হিসেবে তার যতই কেন না মূল্য থাক গান্ধীজী বা তাঁর অনুগামীদের কাছে। মেসিনে উৎপন্ন সুতো এবং সেই সুতোর কাপড় ভিন্ন দেশের লজ্জা-নিবারণ হবার উপায় নেই। এই মেসিনের বহুল প্রচার যা'তে দেশে হয়, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করাই বোধ হয় অধিকতর স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচায়ক, কিন্তু দুঃখের বিষয় গান্ধীজীর রাজনীতি বাস্তব জীবনকে লক্ষ্য করে নি, তাই পলিটিক্সের সঙ্গে তিনি আধ্যাত্মিকতার মিশ্রন ঘটিয়েছেন।

কিন্তু গান্ধী-নীতির সমালোচনা আমার লক্ষ্য নয়। গান্ধীজীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছি এই জন্যে যে গান্ধীজীর এই মত তাঁর একক মত নয়—ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর যতই আধ্যাত্মিক বাতিক থাক না কেন, তাঁর বক্তব্যের মোটা কথাটা আরো অনেকের মুখেই শোনা যায়। কথায়-কথায় গোরুর গাড়ীর যুগে ফিরে চলো বলে' যে হট্টগোল ওঠে বা যন্ত্র-শাসিত নগরের চিত্রকে মর্ম্মান্তিক করে' এঁকে, তার পাশে সুন্দর সরল অনাড়ম্বর মহিমায় গ্রামের ছবিকে ফুটিয়ে যে কবিত্ব করা হয়, তার মূলেও একই বাতিক কাজ করছে বুঝতে হবে।

এই মতের পোষকতায় বলা হয় যে সভ্যতার শৈশবে মানুষের অভাব ছিল অল্প, উপকরণও ছিল কম। তাই জীবনধারণে তখন কোন দুরূহতা ছিল না—অত্যন্ত অনায়াসে অন্ন ও বস্ত্র সংগৃহীত হ'ত এবং তাতেই মানুষ তৃপ্ত ছিল। তার মনোযোগের বেশীর ভাগটা বাইরে নিয়োজিত করতে হ'ত না বলে', সে ভেতরে দৃষ্টি দেবার সময় পেতো, তার ফলে তার আত্মিক শক্তি পূর্ণতা লাভ করতো। মানুষ যেদিন থেকে বাইরের সম্বন্ধে সজাগ হয়েছে, বাইরের দিকে নিজেকে বিস্তারিত করতে আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকেই তার আত্মিক পুঁজি অপচিত হ'তে সুরু করেছে এবং মানুষের সেই অধঃপতন ঘটিয়েছে নাকি তথাকথিত বিজ্ঞান। সুতরাং মানুষকে বাঁচাতে

হ'লে বিজ্ঞানের বিলোপ চাই—তাকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই উপকরণহীন, উত্তেজনাহীন সরল অবস্থার ভেতর। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধীজী সকলেরই মত এই—শুধু মতই নয়, এই মতকে কার্য্যে রূপান্তরিত করার জন্যে তাঁরা তিনজন তিনটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে' সেই আদর্শ স্থাপনের উদ্যোগ করেছেন।

এইখানে বলে' রাখি, এই তিনজন শ্রেষ্ঠ পুরুষকেই আমি সবিশেষ শ্রদ্ধা করি—কিন্তু তাঁদের প্রবর্ত্তিত এই মতবাদকে আমার শুধু অগ্রহণীয়ই নয়, অসার্থক বলে' মনে হয়। সভ্যতার অপরিণত অবস্থায় মানুষের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ ছিল ঠিকই এবং সেই জন্যে বস্তুমুখিতা তার কম ছিল,—এ-কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু সে-অবস্থাটা কি মানুষের পক্ষে খুব গৌরবের ছিল? যে সরল অনাড়ম্বর আত্মজ্ঞান অন্ধ প্রাচীন সভ্যতার দোহাই কথায়-কথায় দেওয়া হয়ে থাকে, সেটা ত মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে একটা মাঝখানকার স্তর মাত্র—তার আগে মানুষের জন্তু-অবস্থার একটি সুবিস্তৃত ইতিহাস আছে, যখন মানুষ থাকতো গুহায়—থাকতো উলঙ্গ হয়ে—থাকতো কাঁচা মাংস খেয়ে। সেই আদিম আচ্ছন্ন অবস্থাকে কাটিয়ে ঐ উন্নত অবস্থায় মানুষ এসেছে যে-শক্তির বলে, সেই শক্তিই তাকে চালিয়ে এনেছে আধুনিক স্তর পর্য্যন্ত। এই মতের পোষকরা যা বলেন, তাতে মনে হয়, যেন মানুষের সভ্যতা মাঝখানকার ঐ স্তর পর্য্যন্ত এগিয়ে তারপর আর এগুতে পারে নি—সেইখানে দাঁড়িয়েই আশে-পাশে অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় আবর্ত্ত রচনা করে' জীবনকে বিপর্য্যস্ত করেছে। কিন্তু অভিব্যক্তির সাধারণ আইন তা নয়—ক্রমিক স্ফুটতার দিকেই প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি। এই গতিকে অস্বীকার করা, জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মকে অস্বীকার করার মতোই অসমীচীন।

জন্তু-জগতের দিকে তাকালে দেখা যায় যে আদিম অবস্থায় তা'রা যে রকম ছিল, ক্রম-পরিণতির ফলে তারা তা থেকে আকারে প্রকারে অনেক বদলালেও, তাদের ব্যবহারিক জীবনের ধারায় কোন বদল হয়নি—এর কারণ সুস্পষ্ট। জন্তু-জগতে মন নামক বস্তু নেই—কাজেই মনের শক্তি দিয়ে দেহের অসম্পূর্ণতাকে তা'রা পূরণ করে' নিয়ে সময়ের গতির সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে নি। তাদের আদিম অসহায়তা আজও অব্যাহত ধারায় ব'য়ে চলে' এসেছে। আদিম মানুষও ছিল এমনি অসহায়—একক এবং বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবে মানুষের সে অসহায়তা আজও সমানই আছে। কিন্তু সেই ক্ষতি পূরণ করে' নিয়েছে মানুষ বহিরুপকরণ দিয়ে—যা তার মন উদ্ভাবন করেছে। এই উপকরণ হচ্ছে যন্ত্র এবং এ হচ্ছে আর কিছুই নয়, তার সসীম শক্তির পূরক (অসীম শক্তির আধার স্বরূপ), এ তারই প্রতিনিধি। খালি হাত-পায় মানুষের শক্তি কতটুকু? জলে সে অনুপায়, শূন্যে সে নিরাশ্রয়—স্থলেও তার অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ব্যাধি-বিপদ নানা দিক থেকে তাকে ঘিরে রয়েছে—দৃষ্টি, শ্রবণ ও সহনশক্তি তার অত্যন্ত কম, এর ওপর সময় ও দূরত্বের ব্যবধান দিয়ে প্রকৃতি তাকে পদে-পদেই কাবু করে' রেখেছে ঠিক জন্তুদের মতো। কিন্তু তবু মানুষ নিরুপায় হয়ে প্রকৃতির হাতে আত্মসমর্পণ করেনি—পদে-পদে সে সহায়ক সৃষ্টি করে' নিয়েছে এবং তারই সহায়তায় জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র আজ তার জয় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

যন্ত্রের সহায়তায় সাড়ে চার শ' মাইলের দূরত্ব এক ঘণ্টায় অতিক্রম করে' মানুষ সময় ও দূরত্বের নির্ব্বিশেষ অস্তিত্বকে আজ আক্রমণ করেছে—জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য যে অক্সিজেন, তাকে মুঠোয় ভরে' আজ সে জলের তলায় ডুব দিয়েছে, মাধ্যাকর্ষণের বাধাকে উপেক্ষা করে' উড়েছে শূন্যে, রঞ্জনরশ্মির সুতীব্র আলো দিয়ে জড়বস্তুর অন্তর্ভেদ করে' তার রহস্য উদ্ঘাটন করেছে, লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্রের প্রকৃতি নির্ণয় করেছে দূরবীক্ষণীর সহায়তায়, আণবিক ব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপকে করতলগত করেছে অণুবীক্ষণ দিয়ে, ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করেছে সিরাম, ভ্যাক্সিন, সার্জ্জারি এবং আরো কত বিচিত্র অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে। এমন কি, মানুষের স্বাভাবিক আকৃতি বা যৌন-সংস্থানকে বদলিয়ে ফেলেছে—পিতা-মাতার দেহসংযোগকে পরিহার করে' জীবসৃষ্টি পর্য্যন্ত সম্ভব প্রতিপন্ন করেছে। আর কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য এবং ব্যবহার্য্য বস্তু ত করেইছে·····এ সমস্তই তার যান্ত্রিক উৎকর্ষের পরিচায়ক।

আদিম অবস্থায় এই সব অসম্পূর্ণতা মানুষের অবশ্যই ছিল, যে-স্বর্ণযুগের দিকে আমাদের বরেণ্য চিন্তাশীলরা সলোভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' রয়েছেন, সেদিনও এরা কম অনধিগত ছিল না·····কিন্তু এদের অভাব বোধ ছিল চিরদিনই, নইলে সকল জাতির পুরাণ এবং উপকথাতেই অলৌকিক শক্তি বলে এই সব অদ্ভুত ব্যাপার নিষ্পন্ন করার এত দৃষ্টান্ত থাকবে কেন? সেই অভাব-বোধই মানুষকে চালিত করেছে, এদের সম্ভাবনীয়তার দিকে এবং সেই চালনার মুখেই যন্ত্র আত্মপ্রকাশ করেছে, মানুষকে দিয়েছে তার অতি-মানুষী শক্তির অধিকার, যা জন্মলগ্ন থেকেই ছিল তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। আমাদের দেশের অত্যাশ্চর্য্য রক্ষণশীলতা বশে আমরা পুরাণ-বর্ণিত ব্যাপারগুলো সত্যি বলে' গলাবাজী করি, কিন্তু সেই সমস্ত ব্যাপারই যখন হাতে-কলমে সম্ভব হয়ে ওঠে, তখন আবার বিশ্ব-শান্তির ধুয়ো ধরে' তার প্রতিকূলতা করতে কোমর বাঁধি। অথচ জীবনধারণের প্রয়োজনে নব্য বিজ্ঞানের যাবতীয় সৃষ্টির সুযোগ নিতেও আমরা কুণ্ঠিত হইনে। চশমা, ঘড়ি, মোটরকার, বৈদ্যুতিক বাতি, বেতারবার্ত্তা, ছাপাখানা, কোনটা না হলেই আজ চলে না—এগুলো আছে বলেই নিই, না, না নিলে আমাদের চলেনা বলেই নিই, তারপর যথেষ্ট অকৃতজ্ঞতা সহকারেই এদের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করি! প্রাচীন আদর্শ ফিরিয়ে আনার জন্যে যে সমস্ত আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, সেখানেও পদে-পদে আধুনিক উপকরণের ভীড় দেখলেই এ-কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে।

বলা বাহুল্য, এটা কিছু দোষের নয়। মানুষ এগিয়ে চলেছে—প্রকৃতি চাইছে তাকে নিরীহ নির্জ্জীব কোলের খোকাটি করে' রাখতে এবং আপন সৃষ্টির বৈচিত্র্যে আপনি স্বয়ং সম্পূর্ণ থাকতে। মানুষ অবাধ্য ছেলের মতো প্রকৃতির অনুশাসন ভেঙে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, সে প্রকৃতির শক্তি হরণ করে' তাকে নূতন করে' কাজে খাটিয়ে নিচ্ছে। প্রকৃতির সঙ্গে চলছে তার দুর্নিবার লড়াই—এই লড়াই-ই হ'ল তার সভ্যতা। এই লড়াইয়ের জন্যে দরকার তার অস্ত্র-শস্ত্রের—বিজ্ঞান তাকে দিচ্ছে সেই অস্ত্র, তার সুযোগ যদি সে না নেয়, তাহ'লে প্রবল প্রতিপক্ষের আঘাত এবং আক্রমণে সে নিজেই ছাতু হয়ে যাবে। তাই যখনই গোরুর গাড়ীর আমলে ফেরার কথা শুনি, তখনই ভয় পাই এই ভেবে যে তাহ'লে কি আমরা শান্তির নামে অবলুপ্তিকে সন্ধান করছি,

কারণ পরিপূর্ণ শান্তি ত মৃত্যুতেই সুলভ! জীবন মানেই ত অশান্তি—বাঁচতে হ'লে অশান্তির হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, আর অশান্তি আছে বলেই ত তাকে অতিক্রম করার চেষ্টায় সভ্যতার মতো জটিল জিনিষ গড়ে' উঠতে পারছে। এ থেকে পিছু হটে' আদিম সরলতায় ফিরে যাবার আয়োজন করা তাই পূর্ণবয়স্ক মানুষের শৈশবে ফিরে যাবার চেষ্টার মতোই নিরর্থক। ওতে জীবনের মূল-নীতিকেই অস্বীকার করা হয়।

বলা হয়ে থাকে, প্রকৃতি মানুষকে কোন বাহুল্য দিতে চায় নি—মানুষ নিজের অপবুদ্ধির তাড়নাতেই বাহুল্যের সৃষ্টি করে' জীবনকে অযথা জটিল করে' তুলেছে। এর চেয়ে পুরাতন প্রশস্তি ঢের ভালো ছিল—কারণ তাতে আতিশয্য ছিল না ব'লেই অভাবের অনুভূতিও ছিল না। বলা নিষ্প্রয়োজন, তা সম্ভব হয় নি ব'লেই চিরকাল বজায় থাকে নি—আর থাকলেও কোন লাভ ছিল না। কারণ, মানুষের তাহ'লে কি ইতিহাস থাকতো? মানুষ যেখানেই তার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, সেখানেই সে প্রকৃতির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে গেছে। প্রকৃতি কি তাকে গাছের ফল, আর নদীর জলের অতিরিক্ত কিছু দিয়েছিল হাতে তুলে? অরণ্য আর গুহা ছাড়া কোথায় দিয়েছিল তার' আশ্রয়? কেন মানুষ ঘর বাড়ী করলো, কেন চাষ-বাস আরম্ভ করলো, কেন ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার আরও করলো, আগুন আবিষ্কার করলো? কৃপণা প্রকৃতি এই সমস্ত মহামূল্য সম্পদ নিজের পেটের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, মানুষকে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়ে বিদায় করতে চেয়েছিল। সেই কার্পণ্য-সঞ্চিত বিত্তকে মানুষ বিদ্রোহ করে' কেড়ে নিয়েছে—আদিম অবস্থায় নিয়েছে সরল উপায়ে, সময় যত এগিয়েছে, অবস্থা ও পারি-পার্শ্বিকের ঘাতপ্রতিঘাতে বুদ্ধি যত প্রখর হয়েছে, আত্মসাতের প্রণালীও হয়েছে তত জটিল।

আজকের জটিলতম অবস্থাকে যদি আমরা সমর্থন না করি, তাহ'লে যে সোপান-পরম্পরার ওপর এই চরম স্তরটি সংস্থিত, তার প্রাথমিক স্তরগুলোর কোনটাকেও ন্যায়তঃ আমরা সমর্থন করতে পারি না। কিন্তু সেটা হবে সব চেয়ে বড় ভুল—এখন থেকে দু'হাজার বছর পরে একবার নজর চালানোর চেষ্টা করা যাক—আজকের এই অতি-যান্ত্রিক সভ্যতা তাদের কাছে নিতান্তই অপরিণত ঠেকবে, তখনকার তুলনায় তারা আজকের এই সভ্যতাকেও হয়ত যথেষ্ট সরল ব'লেই মনে করবে। অতীতের সুবর্ণ যুগেই যেমন সভ্যতার সব শেষ হয়ে যায় নি, আজকের যন্ত্রযুগেও তেমনি সব শেষ হয়ে যাবে না—ক্রমিক অগ্রগমণের এরা এক-একটা ধাপ মাত্র—ধাপের পর ধাপ সভ্যতা এগিয়েই চলছে, মানুষের সুপ্ত বুদ্ধি ও প্রচ্ছন্ন কর্ম্মশক্তি নূতন নূতন পথে নিজেকে ক্রমাগত বিস্তারিত করেই চলেছে। সত্যকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষণী থেকে বিচ্ছিন্ন করে' দেখার ফলেই, এর বিরুদ্ধে আমাদের কণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে।

আধুনিক যন্ত্রোন্নতির বিরোধিতা করতে সাধারণতঃ যে যুক্তিগুলো উপস্থিত করা হয়, তা যন্ত্রগত নয়—সমাজগত। যন্ত্রের প্রসার এবং প্রতিপত্তি পুঁজিবাদীদের করতলে থাকায় হীনবিত্তেরা যন্ত্রের দাসত্ব করে, কিন্তু তার সহায়তা পায় না—এই কারণেই যন্ত্র-সমৃদ্ধ নাগরিক জীবনে আজ অশান্তি এসেছে। কিন্তু এ দোষ যন্ত্রের নয়—সমাজের, যা পুঁজিবাদের পোষক। কিন্তু তাই বলে' যন্ত্রশাসন-মুক্ত পল্লী-জীবনকে ত আর আদর্শ বলা যায় না—যান-বাহন, অশন-বসন, চলাফেরা, আত্মবিকাশ ও

আত্মবিস্তার, জীবনধারণের একান্ত স্বাভাবিক যে সুবিধাগুলো যন্ত্র সকলের জন্যে সৃষ্টি করেছে, তা থেকে বঞ্চিত থেকে সরল জীবন ও উচ্চচিন্তার ধোঁকা দিয়ে মানুষকে কর্ম্মবিমুখ করা ঠিক নয়। পল্লী-জীবনের মোহ সৃষ্টি করে' মানুষকে সভ্যতার ক্রমিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে' একান্তভাবে গৃহ-পরিবেশে অন্তরীণ করা সঙ্গত নয়—তাতে জাতির বা বিশ্বের কারুরই কল্যাণ হবে না। বরং যাতে সকলে প্রচুরায়ত ভাবে অবাধে এবং অল্প ব্যয়ে ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আধুনিকতম যন্ত্রের পূর্ণতম সুবিধা পায়, সেই দিকে নজর রেখেই আমাদের সমস্ত আয়োজন আন্দোলন চালানো উচিত।

যন্ত্রকে স্থূল এবং একান্তই বহিরঙ্গিক বস্তু বলে' উপেক্ষা করা শুধু ভুলই নয়, মূঢ়তা—যন্ত্র ছাড়া মানুষ কি, পশু ভিন্ন? মানুষের আত্মিক শক্তি, তার আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের প্রেরণাই তাকে যন্ত্রের উদ্ভাবনে নিয়োজিত করেছে। একদা অপ্রবুদ্ধ ভাবে মানুষ বিশ্বের তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছিল, আজ যন্ত্রের সাহায্যে সে সেই তত্ত্বেরই রহস্যোদ্ঘাটন করতে অগ্রসর হয়েছে—তাই এখনকার বিজ্ঞান এবং দর্শন একটি বিশেষ জায়গায় এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলেছে—যেখানে ভেতরে ও বাইরে কোন বিভেদের সীমারেখা নেই। যন্ত্র সেই মিলনের ঘটক—কিন্তু কাছের থেকে দেখি ব'লেই মূল জীবন-বেদ থেকে যন্ত্রকে আমরা আলাদা করে' দেখি। তাই দেখি যন্ত্রকে একটা মূঢ়, নির্ব্বোধ, নির্ব্বাক, অমিত শক্তিশালী দৈত্যরূপে। কিন্তু আসলে এ ত'একটা প্রতীক মাত্র—এর পেছনে রয়েছে ক্রিয়াশীল, মননশীল, উন্নতিশীল মানুষের মন—যা আজ জীবাত্মা ও পরমাত্মা, জড় ও চৈতন্য, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে চলেছে।

এই অভিযানের ফলেই জন্মাচ্ছে মানুষের মনে পাওয়ার ওপর অসন্তোষ এবং না-পাওয়ার জন্যে স্পৃহা। প্রতিনিয়ত উপকরণের পর উপকরণ সৃষ্টি করে' মানুষ সেই অপূর্ণতার উর্দ্ধে উঠতে চাইছে। মাঝখানকার এই স্তরটা লক্ষ্য করলে অবশ্য মানুষের বাস্তব অবস্থাকে মোটেই সুখের বলে' মনে হবে না, কিন্তু এই অ-সুখের পথ ধরেই সভ্যতা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। আশা করা যাচ্ছে, এমন একদিন আসবে, যেদিন আর এই অসম্পূর্ণতার দুঃখ মানুষকে পেতে হবে না—যন্ত্র-শক্তির অপরিমেয় আধিপত্যে মানুষ যাবতীয় অতৃপ্তি ও অসন্তোষের হাত থেকেই মুক্তি পেয়ে যাবে। যান্ত্রিক খাদ্য উৎপন্ন করে' প্রকৃতির কার্পণ্য ও বঞ্চনাকে সে প্রতিহত করবে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ঘটিয়ে ব্যাধি ও যন্ত্রণার উপদ্রব দূর করবে, ভূমিকম্প, বন্যা, মহামারী, দুর্ঘটনাকে করে' তুলবে অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভাব্য—জন্ম-মৃত্যুকে নিয়ে আসবে হাতের মুঠোয়। অর্থাৎ মানুষকে আজ যে অবস্থায় দেখছি, তার সে রূপ আর থাকবে না—তার অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্ভাবনী-বৃত্তির সহায়তায় সেদিন পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে প্রকাশমান হবে এবং তাকে সত্যিই করে' তুলবে অমৃতের পুত্র। এটা জপ, তপ, ধ্যান-ধারণায় হবে না, হবে বিজ্ঞানের শক্তিতে। মনীষিরা বলছেন, সেই দিন নাকি পৃথিবীর সাম্‌নে!

কিন্তু আর একটা দিকও আছে। সেদিক থেকে ভেবে অনেকে যন্ত্র-শক্তির এই অতিপ্রসারকে নিন্দাও করছেন। তাঁরা বলছেন, যন্ত্রের উৎকর্ষ যেদিন চরমে পৌঁছুবে, সেদিন এক কোটি

লোকের কাজ নির্ব্বাহিত হবে একটি যন্ত্রের দ্বারা এবং সে-যন্ত্র চলবে আপন প্রাণ শক্তির জোরেই। তখন মানুষের আর কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকবে না—অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ-সাধনের ব্রত নিয়ে যার জন্ম, জন্মগ্রহণের পর সে-ই বিশ্বে একক প্রভুত্ব স্থাপন করবে এবং মানুষকে অনাবশ্যক বোধে ছেঁটে বাদ দিয়ে দেবে। কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্যহীন, প্রয়োজনহীন কোটি-কোটি মানুষ সেদিন নিজের-সৃষ্ট যন্ত্রের হাতেই নিজের সমাপ্তি দেখতে পাবে। ইতিমধ্যেই নানা স্বতোগামী যন্ত্র, রোবট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্র থেকে মানুষকে অনেকখানি সরিয়ে দিয়েছে, যন্ত্র-শিশু পর্য্যন্ত বীক্ষণাগারে দেখা দিতে সুরু করেছে—সুতরাং সে-দুর্দ্দিন এলো বলে'! এঁরা বলছেন, মানুষের ভেতর শিব এবং অশিব দুই শক্তিই প্রচ্ছন্ন আছে—অতি-লোভ এবং অতি-প্রয়োজনের অজুহাতে মানুষ শুধু অশিব শক্তিকেই জাগিয়ে তুলছে, সেই দুরন্ত অবাধ্য শক্তি ফাউষ্টের প্রেতাত্মার মতোই লক্ষ লক্ষ আশু কল্যাণের ফরমায়েস জুগিয়ে, শেষকালে পারিশ্রমিক স্বরূপ একদিন মানুষের সমস্ত সভ্যতাটাকেই দাবী করে' বসবে। সুতরাং আজকের এই বহু-মুখী সুখ-সুবিধা ভাবী উন্নতির পূর্ব্বাভাষ নয়, এ সেই বিরাট ধ্বংস-যজ্ঞেরই সূচনামাত্র।

বলা বাহুল্য সেদিন আমরা থাকবো না, সুতরাং তা নিয়ে আমাদের অনর্থক উদ্বেগ প্রকাশও নিষ্প্রয়োজন। তবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে এতখানি ভয়াবহ করে' চিত্রিত করার পেছনে দু'টো মনোভাব কাজ করছে, এ বেশ বোঝা যায়—এক হচ্ছে, নীতিশাস্ত্রানুমোদিত সেই সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের মোহ, যা বহু শতাব্দীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, আর হচ্ছে, অক্ষমতার ক্ষোভ, যা অন্যে পাচ্ছে অথচ আমরা পাচ্ছিনা—এমন জিনিষের ভেতর ভাল কখনই থাকতে পারে না। এই দুই মনোভাবই যে পরস্পরের অনুপূরক তা আমি আগেই দেখিয়েছি। কিন্তু এজন্যে দায়ী ত বিশ্বের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যা পরিবর্ত্তিত হওয়া হয়ত একদিন অসম্ভব হবে না। মানুষের সেই শুভ ভবিষ্যতের কল্পনাতেই বা আমরা কেন উদ্বুদ্ধ হই না?

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

আধুনিক জার্ম্মান রূপচর্চ্চা

মিহিরকিরণ সেন

এক সময় ইউরোপ গ্রীক ও রোমক সভ্যতা ও শীলতাকে জগতের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ মনে করতো। গ্রীক শিল্পীর দুরূহ রচনার আকর্ষণ ইউরোপের চরম ধ্যানের বিষয় হ'য়ে পড়ে এই চর্চ্চা হ'তে। শরীরের বহিরঙ্গ বৈচিত্র্যকে সুললিত মূর্চ্ছনায় চিত্রে ও মৃত্তিকলায় প্রতিষ্ঠিত করে' ইউরোপ এমনিভাবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।

বস্তুতঃ বহিরঙ্গ লালিত্যকে ইউরোপ যথার্থই রূপবীথিকার আয়তনে বরণ করে' নেয়। এ জন্য প্রাথমিক রেনেসাঁস যুগ হ'তে আরম্ভ করে' আভাসবাদীদের (Impressionist*) কাল পর্য্যন্ত বাস্তববাদের মাথায় রাজমুকুট শোভা পায়; এবং সে বাস্তববাদ অলিগলি, কাদা ও পূতিগন্ধের সকল আড্ডা ও আখড়াকে চাক্ষুষ করে' তোলে। আভাসবাদীরা (Impressionist) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথে যতটা সম্ভব এগিয়ে যায়, তাতে করে' রঙের নূতন গমক সৃষ্ট হয়—প্রলেপ, স্তর, বিন্দু প্রভৃতির (Divisionist †) ব্যবহারে। এমনি করে' বস্তুর বহিরঙ্গ চর্চ্চা সীমাহীন ভাবে বেড়ে চলে।

বিংশ শতাব্দীর সুরুতেই বাস্তববাদের উপর সকলেরই একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহ জাগে। যাকে বাস্তব বলা হচ্ছে তা' এ জগতে একমাত্র ব্যাপার এমন কি প্রধান ব্যাপারও নয় এ রকমের একটা বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হ'তে থাকে। তাই অজানার গভীর ও গুপ্ত গুহার সম্পদ জানতে সকলেই উৎসাহিত হয়। অদৃশ্য জগৎ এজন্যই সকলের আকর্ষণের বিষয় হ'য়ে পড়ে। জড়ত্বের সীমা এ সময় টলমল করতে থাকে। অণুর ঐক্যবাদ বর্জ্জিত হয়, দেশ ও কাল সম্বন্ধে theory of relativity একটা বিপর্য্যয়-মূলক ধারণা উপস্থিত করে। মনোবৃত্তি-বিশ্লেষণ-বিদ্যা মনের অরণ্যের অনেক ধাঁধাঁকে বন্দী করে এবং অনেক খণ্ডস্মৃতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। Radium ও X-ray জড়পদার্থকে ওলট-পালট করে' দেয় নূতন রকমের স্বচ্ছতা সঞ্চার করে' এবং স্থূলত্বের সকল শৃঙ্খলকে চূর্ণ করে। এমনি করে' ভিতরকার এই অজানা ও অসীম জগৎ বেরিয়ে এল

* আভাসবাদীদের রচনায় খুঁটিনাটি রেখাঙ্কন থাকে না। এঁদের মতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতর সূক্ষ্ম রেখা ও সীমালীলা কারও চোখে পড়ে না। কয়েকটা মোটা বর্ণস্তর মাত্র চোখে পড়ে। এজন্য খুব নিকট হ'তে এসব ছবিকে ঝাপ্‌সা ও অস্পষ্ট বোধ হয়—কিন্তু দূর হ'তে মনে হয় সব-কিছুই ঠিক ও নিখুঁত। Monet ও Manet ফ্রান্সে এই রীতির প্রতিনিধি।

† আভাসবাদীদের বর্ণব্যঞ্জনা ততটা নির্ভুল ছিল না। দুইটি রঙ না মিশিয়ে পাশাপাশি রেখে দূর হ'তে দেখলে মনে হয় রঙগুলি আপনা-আপনি মিশ খেয়ে গেছে। এ জন্য Divitionist বা Pointillistরা রঙ না মিশিয়ে পাশাপাশি দেন।

বিজ্ঞানের ভোজবাজিতে। তাই লোকের চোখ ফিরলো অন্যদিকে। যারা নেহাৎ অধ্যাত্মবাদী তারা এই বাস্তবতাকে প্রত্যাখান করে' আত্মার পুনর্জন্মবাদ, খ্রীষ্টীয় চার্চের ধর্ম্মসংস্কার, Salvation army ও থিওসফির দিকে চোখ ফিরায়। কিন্তু ইউরোপ প্রাকৃতবাদকে একেবারে প্রত্যাখান করেনি কোনকালে—বাইরের সত্য খুঁজে হয়রান হ'য়ে ভিতরের বাস্তবতার দিকে অগ্রসর হয়েছে মাত্র।

'প্রলোভন'.....(Beckmann)

কিছুকাল পরে বাইরের আভাষ হ'তে চিত্র ফিরিয়ে "the picture dictated from within"-এর দিকে সকলে আকৃষ্ট হয়। জার্ম্মানীর "Brucke" চক্র এমনিভাবে সৃষ্ট হয়। "Their pictures were hasty and tumultuous—only it was a tumult from within, the imaginary moment of a look into the depths."

এর পর এল "Blauer Reiter"—যা' অধ্যাত্ম ভূচিত্র রচনা করে' আবার জার্ম্মান চিত্তকে অন্তর্মুখীন করে।

"Brucke" চক্রের Kirchnir, Max Pechstein, Emile Nolde প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রকর। এঁরাই হ'লেন জার্ম্মানীর আদি Expressionist* বা অন্তরঙ্গ চিত্রকর। বাইরের মিছে রূপকে বর্জ্জন করে' ভিতরের জটিল সত্যকে উদ্দীপন করতে এঁরাই প্রথম অগ্রসর হন। এঁরাই বহিরঙ্গ রূপ বর্জ্জন করেন।

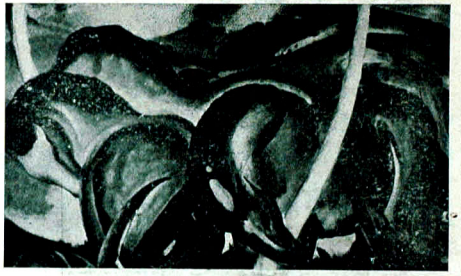

'নীল অশ্ব'.....(Marc)

কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অনুবীক্ষণ এবং কোন অনুভূতিকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে দেখে সে প্রসঙ্গে একটা রূপের বিপ্লব উপস্থিত করা যায়। অত্যুক্তি, আকুঞ্চন ও আনবিক, চুল-চেরা, কাটা-ছাঁটা প্রভৃতি সম্ভব হয় যদি মনের cellগুলির শেষস্তরের তরল ও বায়বীয় প্রেরণাকে মুখ্য করা হয়। এমনি করে' সব-কিছুকেই মনে করা যেতে পারে ছেঁড়া, টুকরো, ভাঙা ও ওলট-পালট ব্যাপার। শিল্পী Kokoschka-র রচনা এজন্য আপাততঃ ফরাসী আভাষ বা ছায়া-পন্থীদের (Impressionist) মত বোধ হ'লেও বস্তুতঃ তা অন্তরঙ্গ (Expressionist) চিত্র।

তাই ভিতরকার সত্যের অনুসন্ধানের পথ অতি জটিল হ'য়ে পড়ে। Meister Eckehart বলেন: "The shell must be broken and what is within must come out for

* যাঁরা প্রাকৃতিক বাইরের আবরণ বা রূপ ভেঙে চুরে একটা অন্তঃপ্রকৃতি দেখাতে চান তাঁদের Expressionist বলা হয়। এঁদের রচনায় Symmetry বা বাইরের কোনরকম প্রচলিত সঙ্গতি দেখা যায় না। এঁরা কোন বিশিষ্ট ভাবকে বিকশিত করতে চান ভাঙা-চোরা রচনার ভিতর দিয়ে। Matisse প্রভৃতি চিত্রকর এ-শ্রেণীর।

if you wish to have the kernel the shell must be broken." এক তীরে আছে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগৎ, আলো ও ছায়ার পরপ্রেক্ষিতের ব্যাপার, বর্ণস্বরের সমবায় এবং বিশ্লিষ্ট রঙের খেলা — অন্য দিকে অর্থাৎ বিপরীত দিকে আছে বস্তুহীন, রূপবর্জ্জিত আদিম জগৎবস্তু (matter) যার ভিতর হ'তে একটা রূপপর্য্যায় সৃষ্টি করে' তুলতে হবে। এই আদিম ভ্রূণজগৎকে—'a world without object'-কে—অন্তরঙ্গ চিত্রকরগণ একটা পরমার্থ সত্তা দান করতে অগ্রসর হন অনুভূতির অজানা ও অলিখিত দৃষ্টি হ'তে।

'পাখী'.....(Ernst)

এমনি করে' ইউরোপে অতিপ্রাকৃত (Sur-real*) কলার জন্ম হয়। চিত্তের মুকুরে যে ছবি স্বাভাবিকভাবে পড়ে তা নয়—যে ছবির অনাহত লীলা চিত্তের অন্তঃপুরে অনর্গলভাবে বিহার করছে—সে সব নিষ্ঠুর, দুঃসহ, ভীষণ, ইতর, অসংযত ও জান্তব হ'লেও ক্ষতি নেই—কারণ সে-সব বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা কৃত্রিমভাবে রচিত নয় এবং ভদ্রতার 'মস্বাভাবিক' কঞ্চুকেও ঢাকা নয়। অতি-

* 'বিখ্যাত শিল্পী Dali ও আর্নষ্ট প্রভৃতি এ রকম চিত্রকলার প্রবর্ত্তক। এর ভিতর logic নেই—না থাকাটাই বাহাদুরী। এঁদের মতে আর্ট anti-intellectual ব্যাপার। সব-কিছুই হেতুহীন এলোমেলো হেঁয়ালীর মত। একটা রূপের ছন্দ এ-সব সৃষ্টিতে আছে।

প্রাকৃত আর্টের বস্তু চিন্তার গলিত ও উষ্ণ কটাহে অহরহ পাক হচ্ছে—সে-সব অমার্জ্জিত ও অশোভন। তবুও সে-সবকে সুশোভন করা হচ্ছে করতালি দিয়ে।

নানাভাবে এই নূতন সৃষ্টির আয়োজন হয়েছিল। কোন লেখক বলেন: "Using the sensitive plate of modern apparatus and inspired by giant telescopes or the x-ray photograph, these painters groped about in a world of forms which though hitherto a mystery and never yet catalogued, yet existed." এ জন্য "Composition"-এর পরিবর্ত্তে "decomposition"ই প্রধান ব্যাপার হয় এবং বর্ণসামঞ্জস্যের মামুলি তারল্য (colour harmony values) বর্জ্জিত হয়। এতে এল বিপ্লব ও প্রলয় এবং একটা অফুরন্ত ওলট-পালট ব্যাপার। আর্টের এই বিপর্য্যয় ইউরোপের ইতিহাসের একটা স্মরণীয় ঘটনা। প্রকৃতির বাইরের আবরণের ভিতর আছে মগ্ন জগৎ—অফুরন্ত রহস্যে তা' পূর্ণ। নষ্টচিত্ত ও দুষ্টবৃত্তি সে-সব গুহার ভিতর চলাফেরা সুরু করে।

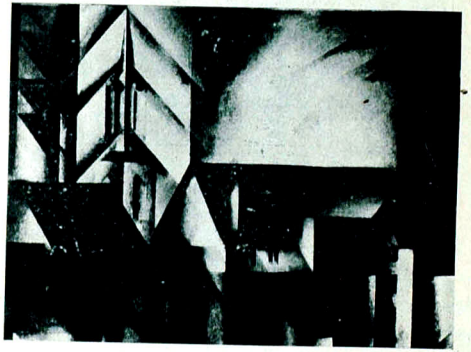

'Teltow'.....(Feininger)

ছায়াপন্থীদের (Impressionists) রচনা যেমন দ্রুত ও ক্ষণিক ব্যাপার (instantaneous) তেমনি সে-সব তুমুল বিপর্য্যয়ে পূর্ণ। 'Brucke' চক্রের রচনাও, এ রকমের ক্ষণিকবাদ ও আলোড়নে পূর্ণ কিন্তু এই ঝড় ভিতরকার ব্যাপার। গভীরতম ভিতরকার দৃষ্টি হ'তে এ সবের জন্ম হয়েছে। এর পরে এল "Blauer Reiter"চক্র। এ-চক্রে ইন্দ্রিয়ের পরিধি অতিক্রমের সাধনা আছে—আত্মার সূক্ষ্মতম

সিংহাসনের দুর্লভ প্রান্তকে স্পর্শ করার সাহসিকতা এ সব ছবিতে সুস্পষ্ট। এ যেন স্বপ্নজগতের অনুসরণ—সত্যিকার পার্থিব চিত্রচর্চ্চা নয়।

'Brucke' চক্রের তারকাসম্প্রদায় (Stars) জার্ম্মান অন্তরঙ্গ কলার একটা নূতন অধ্যায় সূচনা করে। Heckel, Kirchner, Nolde, Pechstein প্রভৃতি শিল্পী সমগ্র ইউরোপে একটা নূতন পতাকা উত্তোলন করেন।

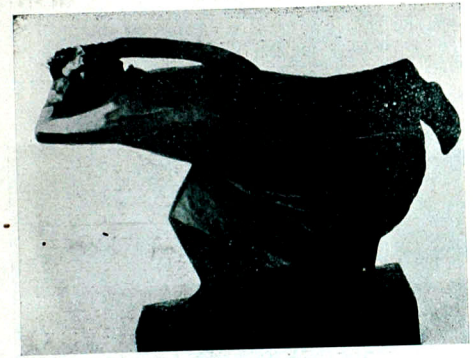

'The Avenger'.....(Barlach)

জার্ম্মানীর অতিআধুনিক 'Der Blaue Reiter' চক্র প্রকৃতির দোহাই দিয়েই প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করতে চায়। শিল্পী Marc বলেন : "Nature is everywhere in us and outside us; there is one thing that is not altogether nature but rather the overcoming and interpreting of nature : art. Art has always been and is in its essence the boldest departure from nature and naturalness. It is the bridge into the spirit world···the necromancy of the human race."

বিস্ময়ের বিষয় এ বিষয়ে জার্ম্মান শিল্পীরা ত্রিনয়নের উল্লেখও করেছেন। বস্তুতঃ আর্টের সাহায্যে যে চরম সত্যকে পাওয়া যায় শিল্পী Klee এ কথা উৎসাহের সঙ্গে বলেছেন : "Art plays an ignorant game with ultimate things but reaches them nevertheless". এই

চক্রের শিল্পী Klee একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর। তিনি আর্টের ভিতর দিয়ে একটা অজানা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই শিল্পীর "Poison" "Flower Eater" প্রভৃতি অদ্ভুত সৃষ্টি।

Wassily Kandinsky 'Blauer Rieter'চক্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ চিত্রকর। তাঁর চিত্রকলা অবস্তুতন্ত্র (abstract)—তাতে কোন বস্তুর চেহারা নেই। Klee ও Kandinsky ১৯২২ সালে Bauhaus ও Dessian তাঁদের শিল্পাদর্শ প্রচার করতে সুরু করেন। Kandinsky, "Art of Spiritual Harmony" নামক বইতে একটা নূতন আদর্শ প্রচার করেন। এই আদর্শ জার্ম্মান Suprematistsদের জড়বাদের একটা প্রতিবাদ স্বরূপ ছিল। Kandinsky জড়বস্তুর জড়রূপ বর্জ্জন

'The Angel of Gustrow'·····(Barlach)

করে' শুধু কতকগুলি রেখার হিল্লোল ও রঙের ভঙ্গীর সাহায্যে একটা অপ্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট করে' পুলকিত হয়েছেন। এ রকমের অনেক চিত্রের নাম তিনি দিয়েছেন "সুর"। "Blauer Reiter" চক্রের Feininger একটা নূতন রকমের ঘনপন্থী (cubic*) আর্ট সৃষ্টি করেন। এ সব স্বচ্ছ ত্রিকোণ কাচফলকে বিভক্ত রঙীন স্বপ্নের মত। এর ভিতর হ'তে এক অপরূপ ছন্দলোক জন্মলাভ করেছে।

* ঘনপন্থী চিত্রকলা দৃশ্যমান জগতের Surface বা তল ত্যাগ করে' ঘনত্বের (depth) দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। সে ঘনত্বকে উদ্ঘাটন করে' বস্তুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—তা'ই তা' অদ্ভুত হয়েছে। Picasso এর প্রবর্ত্তক।

Baumeister মানুষকে একটা যান্ত্রিক রূপভালিতে পরিণত করেছে—সব যেন ফরমূলা মতে তৈরী। বর্ণের planned economyতে এ সব ছবির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে—এ সব রূপক নয়—যন্ত্রবাদ ও শক্তিবাদকে রূপের পরিচ্ছদ দানের চেষ্টা মাত্র।

Max Ernst তর্কশাস্ত্র ও বাস্তবতার অতীতে একটা নিষিদ্ধ জগৎকে বরফের মত ঘন করে' তুলেছেন। ছাঁকা ভাবের রসসম্পুট অপৌরুষেয় মুখভঙ্গী, ভোগের অসম্ভব কাণ্ড একসঙ্গে এই শিল্পী উপস্থাপিত করে' আমোদ পেয়েছেন।

বস্তুতঃ জার্ম্মান শোণিতে গথিক গাঁথুনির বহিরঙ্গ গুরুত্ব ও অন্তরঙ্গ জমাট কৃষ্ণতা কিছুতেই ভুলতে পারিনি। সে সব সমস্ত রচনাকে আচ্ছন্ন করেছে এ-যুগে। জার্ম্মান ভাবুকতা চিত্তের বিচিত্র অজানা গমককে যেন বর্ণমালায় পরিণত করেছে। রূপকে অরূপের ভঙ্গীতে এবং অরূপকে রূপের বৃন্তে ফুটিয়ে তোলা এই অপরূপ স্বপ্নলব্ধ বর্ণমালার সাহায্যে সম্ভব হয়েছে। এ যেন ভারতীয় তান্ত্রিকের শবসাধনের মত। অসীম মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনের সহস্র রহস্য-মুকুল পুষ্পিত হয়ে উঠ্‌ছে—দেশকালের বিপ্রলব্ধ ও বিপর্য্যস্ত সন্ধিস্থলে। এজন্য ইউরোপের যুদ্ধোত্তর শিল্প মৃত্যুর সাহায্যে ভারতের তান্ত্রিক শিল্পের মতই এক অজানা ধূমকেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়েছে।

Beckman আধুনিক জার্ম্মান চিত্রকরদের ভিতর সবচেয়ে অধিক জীবন্ত। শিল্পীর রচনায় বাজীকরের কাণ্ড ও এক অদ্ভুত রূপার্থ বিম্বিত হয়। অপ্রাকৃত ও ভূতের দুনিয়া যেন বেক্‌ম্যানের রচনায় ঘোরা ফেরা করে। সব যেন নূতন মুখোস পরে' চলা ফেরা করছে মনে হয়। শিল্পী অন্তরঙ্গ বা ভিতরের দিক হ'তে সমগ্র রচনাকে ওলট-পালট করেছেন একটা বলিষ্ঠ রসসৃষ্টির জন্য।

শিল্পী আর্নষ্টের রচনায় জার্ম্মান রহস্যবাদ ও ফরাসী অবিশ্বাস সঙ্গত হয়েছে। সত্য ও মিথ্যা এক সঙ্গে জড় করা হয় আর্নষ্টের চিত্রকলায়। 'পাখী' চিত্রখানি দুনিয়ার পাখী নয়, এটাতে একটা দানবীয় সৃষ্টিকে নক্সার তালে ফেলে শিল্পী পুলকিত হয়েছেন।

শিল্পী Feininger যন্ত্রযুগের পদ্ধতি চিত্রার্পিত করেছেন। সব-কিছুই শিল্পীর রেখার ও রঙের প্লানের ভিতর সঞ্চারিত হয়েছে।

Baumeister কান্দিন্‌স্কী কল্পিত অবস্তুতত্ত্ব রচনায় উৎফুল্ল হয়েছেন। শুধু অবাস্তব রেখা ও রঙের প্রসঙ্গে একটা গূঢ় রসকে উদ্দীপ্ত করা ছিল এ শিল্পীর লক্ষ্য। একে abstract রচনা বলা হয়।

Barlach আধুনিক জার্ম্মান ভাস্করদের ভিতর অসাধারণ শক্তিশালী শিল্পী। তাঁর মূর্ত্তিকলা খাঁটি জার্ম্মানভাবপুষ্ট। প্রাচীন Nordic জীবনবাদ ও আধুনিক Expressionism-এর একটা বিস্ময়জনক সমন্বয় হয়েছে এই প্রতিভাবান শিল্পীর রচনায়। শিল্পীর "The Avenger" নামক মূর্ত্তিতে এক অসাধারণ বলিষ্ঠতা ও উদ্দাম গতিবেগ প্রকট হয়েছে। অপরদিকে "The angel of Gustrow" মূর্ত্তিতে আছে একটা প্রশান্ত স্থিতির অবস্থা। এই জার্ম্মান শিল্পী প্রাচ্য বুদ্ধমূর্ত্তির প্রশান্ততা পশ্চিমে সঞ্চারিত করতে সাহস করেছেন। স্তিমিতলোচন এই মুখশ্রীতে একটা তৃপ্তিমূলক শান্তির প্রভা দীপ্ত হচ্ছে। বস্তুতঃ আধুনিক জার্ম্মান চিত্রকলা বর্ত্তমান যুগের সকল সমস্যা ও সন্দেহ, আয়োজন ও আন্দোলন পুঞ্জীভূত করে' ইউরোপের কলাকেলিকে রূপের কুহকে পূর্ণ করেছে।

গায়ত্রী

হেমচন্দ্র বাগ্‌চী

এই বনভূমিতে
কি এক পাখী ডাকে— কুক্, কুক্ :
নহবৎ-বাজিয়েদের একজন যেমন করে
সুরের কারুকাজ—
আর একজন যেমন তান লাগায়
দীর্ঘ একতান
তেম্‌নি ঐ পাখী ডেকে চলে—কুক্ কুক্ :
সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে বেলা।

ও যেন খুব বড় একটা ছবির
অদৃশ্য সুরের পটভূমি :
তা'র সঙ্গে হাজারো পাখী
কারুশিল্প রচনা করছে—
পাপিয়া, কোকিল, ক্যাঁচ্‌কেঁচে, শালিখ আর কাক
মাঝে মাঝে মোরগের ডাক শোনা যায়—
সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে বেলা
এই বনভূমিতে।

অরুণ-সারথি সূর্য্যের রথ
উঠে পড়েছে পূব্ গগনে
ছড়িয়ে পড়েছে কিরণ-মালা বনে বনে
গাছেদের মাথায় মাথায়
পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়
তুষারাচ্ছন্ন হিমমরুদেশে
সাহারা মরুভূমিতে
মহেঞ্জদড়োর খনিত স্তূপে

ধ্বংসে, সৃষ্টিতে বিশ্বভুবন জুড়ে
তরঙ্গিত নীল বারিধীর বুকে
পৃথিবী পার হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে আলো
মহাকাশ জুড়ে :
'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।'

এই তরুরা
ছায়া প্রসারিত করেছে—
দীর্ঘ ছায়া।
শিশু, লিচু, আম-কাঁঠাল, অশ্বত্থ।
দূর্ব্বাশ্যামল পৃথিবীর বুকে
অগণিত বীজের উদ্গম :
ছায়া ঘুরে ঘুরে চলেছে
তির্য্যক, সরল, বক্র রেখায়
ফাঁকা মাঠে, পতিত জমিতে
উদ্ভিন্নযৌবনা শস্যসম্ভবা মাটিতে
ছায়া ঘুরে ঘুরে চলেছে
আসসেওড়া, সেঁয়াকুল, কণ্টিকারীগুল্মে
আচ্ছন্না মাটিতে
দীর্ঘ, সরল, বক্র ছায়া।
শোষণ করেছেন সূর্য্যদেবতা
আমাদের জল।
শীর্ণা নদী আর বিদীর্ণ তড়াগ।
পৃথিবী যেন তাঁর শুষ্ক মুখখানি
তুলে ধরেছেন আকাশের দিকে—
তাঁরই তৃষাবিবর্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস
ব'য়ে নিয়ে আসে ঐ তরুরা
তা'দের পল্লবের আন্দোলনে
মরুমরীচির নিঃশ্বাস।

ধূলিময় রুক্ষ পথ বেয়ে
চলেছে ছেলে-বুড়োরা
মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে
কাদাজল নিয়ে আস্‌বে তা'রা—
এরা যেন কীটপতঙ্গ
কিংবা তা'রও চেয়ে অধম
তা'রও চেয়ে নিম্নস্তরের প্রাণী।
মুহূর্ত্তেই বেড়ে উঠল উত্তাপ
পাখীদের স্নিগ্ধ মায়াসজল কণ্ঠে এল
বিষণ্ণতার সুর।
ছড়িয়ে পড়ল রৌদ্রজ্বালা আমার এই দুনিয়া জুড়ে।
ছড়িয়ে পড়ল কুঁড়েঘরে,
বিবর্ণ ধূসর আকাশে
ধূসর প্রাসাদে আর পিচ্‌ঢালা রাস্তায়
ছড়িয়ে পড়ল রৌদ্রজ্বালা
দেহ থেকে মনে,
নিমীলিত চোখে অনুভব করি
হে অরুণসারথি, তোমার গতি আর তীব্রতা—
আর ভাবি মনে মনে :
কবে নাম্‌বে তোমার শ্যামল স্নেহধারা
যা' শোষণ করো তুমি,
তা' কবে দেবে ছড়িয়ে ?
তোমার সেই স্নেহ-মুক্তাধারা
কবে নাম্‌বে মাঠ-বাট একাকার ক'রে,
বৃত্রাসুরকে বধ কর্‌বে কবে তুমি ইন্দ্র ?

একটা তৃষ্ণার্ত্ত গরু
তা'র সমস্ত জিহ্বা বা'র ক'রে বারে বারে
নাকের উপর বুলোচ্ছে।

এই বনভূমিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় গরু
দলছাড়া হ'য়ে।
—নিরভাব, উদাস আর মন্থরগতি।
মাঝে মাঝে টুপটাপ ক'রে
খ'সে খ'সে পড়ে আম লিচু
তাই এদের আহার।

চেয়ে চেয়ে দেখি
বৃষ্টি হ'য়ে গেছে কাল :
বৃষ্টিতে আর রৌদ্রে মিশে
সে এক অপরূপ ঝল্‌মলে নিদাঘ প্রভাত :
বৃষ্টিতে ভেজা গাছগুলিতে পড়েছে রোদ্—
তা'রি একটা স্নিগ্ধসজল মাটি-মাটি গন্ধ আসে।
তবু বেড়ে চলে বেলা :
কুক্ কুক্ ক'রে ডাকে সেই পাখী
ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়
তা'র সেই একটানা ডাক বন থেকে বনান্তে।
আকাশ জুড়ে বৈশ্বানরের তাণ্ডব ওঠে জেগে :
জানিনা আকাশের কি রূপ,
মনে হয় তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটে ছড়িয়ে পড়ছে
'লাভা'র মত গলিতহিরণ কিরণ-ধারা
সৃষ্টি আর ধ্বংস বাজে তা'র স্পন্দনে স্পন্দনে।
বেড়ে চলেছে বেলা :
পাখী তা'তে দেয় সুর,
তাপদগ্ধ তরুদের স্নেহ এসে লাগে তা'তে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপায়িত হ'তে থাকে সবিতার অগ্নি :
শেষে সবুজ হ'য়ে
উজ্জ্বল হ'য়ে
মানুষের জীবনে
রাখে তা'র চিরন্তন শ্যাম স্পর্শ।
'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।'

অপচয়

জ্যোতির্ম্ময় রায়

ছোট সহর। লম্বালম্বি দু'টাই মোটে বড় সড়ক। তারই এপাশ-ওপাশ হইতে সরু ও চওড়া অনেকগুলি রাস্তা শাখা-প্রশাখায় ছড়াইয়া গিয়া মিশিয়া গিয়াছে মাঠ বা কাঁচা রাস্তার সঙ্গে—পাকা শহর যেন শিকড়বাকড় মেলিয়া কাঁচা মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে।

বড় রাস্তার উপরেই হরিহর কবিরাজের ডিস্‌পেন্‌সারী। চার-চালা টিনের ঘরের নীচু চালের উপর লম্বা তারের টানায় খাড়া হইয়া আছে চৌকা সাইনবোর্ড : বিলিতি ঢং-এর বড় বড় বাঙলা হরফে লেখা 'মঙ্গলচণ্ডী ঔষধালয়'। ঘরের ভিতর সান-বাঁধানো মেঝেয় ভাঁজ-করা ছালার উপর হামান-দিস্তা রাখিয়া সুরেশ ঔষধ চূর্ণ করিতেছে। সুরেশের মুখে বোকাত্বের ভাবটা এত পুরু ও স্পষ্ট, মনে হয় চাঁচিয়া লওয়া যায়, এবং লইলে অনেকখানি হইবে। সমগ্র মুখমণ্ডলের মধ্যে শুধু চিবুকে ছাড়া-ছাড়া ভাবে যে কয়গাছি দাড়ি খাড়া হইয়া আছে যে-কোন লোককে খামকা চটাইয়া দিবার পক্ষে তা যথেষ্ট। ভেষজ কুটিতে-কুটিতে সে গান ধরিল—

কপালে সিন্দুর
পায়েতে আল্‌তা
গলে শোভে ফুল হার…

দুব্ দুব্ ঘটাং ঠং—কপালে সিন্দুর…
অম্বিকাচরণ ধমকাইয়া ওঠে : ফের এই গান!
—গামু তো, খুসি আমার।

মুখে বলে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ সুরেশ গান থামাইয়া দেয়। এই গান গাহিয়া দু'বছর পূর্ব্বে আশেপাশের সকলকে সে তিক্ত ও ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। একটি মাত্র সঙ্গীত সম্বল করিয়া সহরে জীবনের প্রারম্ভিক অনভ্যস্ত দিনগুলি সুরেশ কাটাইয়া দিয়াছে। গানটি শুনিয়াছিল সে দত্তবাড়ীর মরণীর বিবাহের সময় পাড়ার বউদের মুখে : ঝুলিয়া-পড়া লম্বা ঘোমটাকে এক হাতে তুলিয়া ধরিয়া মুখোমুখি পাঁচ ছয় জন জড়ো হইয়া উঠানে বসিয়া গাহিতেছিল—'কপালে সিন্দুর পায়েতে আল্‌তা…।'

মরণীকে সুরেশের মনে পড়ে বৈকি, বেশ রাগ ও দুঃখের সঙ্গেই মনে পড়ে। নেহাৎই মা তার অসময়ে মরিয়া গেল বলিয়া, নহিলে মরণীর মা'র মুখের উপর মরণীর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে ঘরে তুলিবার ব্যবস্থা তো একপ্রকার ঠিক করিয়াই ফেলিয়াছিল। মা'র মৃত্যুর পর কিন্তু সব-কিছুর রঙই যেন বদলাইয়া গেল : তার বিবাহের পরিবর্ত্তে বিবাহ করিল তার বাবা, এবং নূতন মাতৃত্বের তাড়নায় টিঁকিতে না পারিয়া গ্রাম ছাড়িয়া সে পলাইয়া বাঁচিল। যেদিন নিজের হাতে সুরেশ মা'র কপালময় সিন্দুর লেপিয়া দিল, পায় পরাইল আল্‌তা, তারপর ফুল দিয়া সাজাইয়া কাঁধে তুলিয়া লইল, সেদিন

হইতে তার প্রিয় গানের সুখের স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া জাগিয়া রহিল একটি বেদনার ছবি। বিবাহ-বাড়ীর বাতি নিভিয়া গেল, বাদ্যভাণ্ড থামিয়া গেল, চেলি-পরা ছোট্ট বধূকে একপাশে রাখিয়া সিন্দূর-আলতায় সজ্জিত মায়ের নিষ্প্রাণ দেহটি গানের সুরে স্পষ্ট হইয়া রহিল।

কবিরাজী শিখিতে আসিয়া কয়েকটা দিন সুরেশ আলমারীতে সাজানো শিশি বোতল ও বৈয়মের গায়ে-আঁটা লেবেল পড়িয়া কাটাইয়া দিয়াছিল। আমবাত ও জ্বরের ওষুধের শিশি দু'টার দিকে বেদনাহত দৃষ্টি নিয়া সে তাকাইয়া থাকিত: 'শম্বু কবিরাজটা হাতুইড়া' নতুবা মা তাহার বাঁচিত, এ বিশ্বাস তার আজও যায় নাই। কবিরাজী ওষুধের নামগুলি পড়িয়া কেবলই মনে হইত, রোগ-জরা-মৃত্যু এ সকলকে ভয় করিবার কোনই কারণ ছিল না, যদি না কলির কবলে পড়িয়া পুরাকালের তেজ ওষুধ হইতে উবিয়া না যাইত। মৃতসঞ্জীবনী বলিয়াও তো ওষুধ নাকি আছে, হিমালয়ের গভীর অরণ্যে পাওয়া যায়: অশরীরী দেবতারা যেখানে সশরীরে ঘুরিয়া বেড়ান, সামান্য দয়া করিলে আজও যাঁরা মাকে তার ফিরাইয়া দিতে পারেন—বিরাট উঁচু, ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ একটা স্থান কল্পনা করিয়া সুরেশের মন কত কী-ই না খুঁজিয়া বেড়াইত।

এ-সব দু'বছর পূর্ব্বের কথা। সুরেশ এখন গজল শিখিয়াছে। আজ যে পুরানো গানটা মনে পড়িয়াছে তা-ও মাকে স্মরণ করিয়া নয়, উল্টা দিক্‌কার বাড়ীর দিকে চাহিয়া।

নূতন সরকারী ডাক্তারের ডাগর মেয়েটি বেণী দুলাইয়া শ্লিপার পায়ে সাম্‌নের বারান্দায় খোলা-বই হাতে পায়চারী করিতেছিল; সুরেশ চাহিয়া ছিল সেই দিকে। চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা করে না বটে, কিন্তু উহাকে অবলম্বন করিয়া ভাল-মন্দ কোনো চিন্তাও তার মাথায় স্থান পায় না। এ ধরণের মেয়ের সঙ্গে কেমন করিয়া কথা বলিতে হয়, কেমন করিয়া আদর জানাইতে হয় ভাবিতে গিয়া মন তাহার থমকিয়া থামিয়া থাকে। মনে পড়িয়া যায় মরণীকে: চিন্তার বল্গা ছাড়িয়া দিয়া অনেক দিন পরে সে গান ধরে—তার সেই পুরাতন গান।

অম্বিকা কলাপ-ব্যাকরণ সাম্‌নে লইয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে বারান্দার দিকেই চাহিয়া ছিল, ধমক দিয়া গান থামাইয়া বলিল: মেয়ের দিকে চাইয়্যা গান গাওনের মজাটা বুঝামু, আসুক কবিরাজ মশয়।

—তুমি যে চাইয়্যা চাইয়্যা ঝিমাও, সেইকালে কিছু দোষ অয় না, না?

—আমারে তো চিনে। সেদিন কবিরাজ মশয়ের চিঠি নিয়া গেলাম, কইল, 'বসুন, বাবা আসচেন।' যা না তুই, চাকরের মত খাড়া কইরা রাখবো—আহাম্মক।

—দ্যাখো, আহাম্মক কইবা না, কইলাম, হ। সুরেশ চোখ গোল করিয়া অম্বিকার দিকে তাকাইল।

—বড় যে চক্ষু রাঙ্গাইতে শিখছস্, য্যাঁ—বলিয়া অম্বিকা তার ক্ষীণ দেহটাকে বাঁকা করিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। আর বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করিতে বোধ করি সাহস পায় না।

সুরেশ হামানের মধ্যে দিস্তা ঠোকে দুব্‌দুব্, হাতের সুস্পষ্ট পেশীগুলি তার নাচিয়া কাঁপিয়া ওঠে।

অম্বিকা ও সুরেশ দু'জনেই হরিহর কবিরাজের ছাত্র অম্বিকা ম্যাট্রিক পাশ করিয়া

আসিয়াছে, সে রীতিমত অধ্যয়ন করে আর বড়ি পাকায়। সুরেশ মূর্খ, সামান্য তার পাঠশালার বিদ্যা; সে ওষুধ চূর্ণ করে, প্রকাণ্ড কড়ায় খস্তার মত খুন্‌তি চালাইয়া অরিষ্ট জাল দেয়, ঘর ঝাঁট দেয়, বাজার করে—এমন আরও অনেক কিছুই তাকে করিতে হয়।

হিন্দু-বাখরখানিওয়ালা নিবারণ ডালার উপর কঞ্চি নাড়িতে-নাড়িতে দরজায় আসিয়া হাঁক দিল: বাক্‌থো—

সুরেশ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নিবারণ ভাঁজ-করা ছেঁড়া ও মলিন কাঁথার তলা হইতে দৈনিক বরাদ্দ পয়সা-মূল্যের দু'খানা খাস্তার বাখরখানি বাহির করিয়া সুরেশের হাতে দিল। দু'জনের ভোরের জলখাবার। ফেনাভাতের পরিবর্ত্তে এক চাক্‌তি বাখরখানিযোগে জল খাইলে সুরেশের পিপাসা মেটে বটে, ক্ষিধাটা যেন চাগিয়া ওঠে।

ডালাটা কাঁধে তুলিয়া নিবারণ বলিল: বাকি পয়সা চাইরটা সুরেশ বাই—

লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সুরেশ একদিন দু'খানা ক্ষীরপুলী খাইয়াছিল—দিন পনেরো হইয়া গেল, দামটা সে দিতে পারে নাই, কবে পারিবে তারও ঠিক নাই।

সুরেশ উত্তর করিল: দিমুরে বাই দিমু···খারও তামুক আনি।

—না, তামুক না, বিকির সময় কি খারন চলে···আইচ্ছা রে বাই একটু ওষুধ নি দিবার পার, প্যাটের কামড়ে মাইয়াটা এক এক দিন মরণের দাখিল অইয়া যায়।

সুরেশ মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল: না বুইঝা কি ওষুধ দিবার পারি কও, আমার কাছে ঐ সব চাল-চালাকি পাইবা না, হ। কবিরাজ মশয়রে আইনা দেখাও।

—দেখাইমু তো, ওষুধ?

সুরেশ চোখ টিপিল। অর্থাৎ সে-ব্যবস্থাটা সে-ই করিবে। সুরেশ ভরসা রাখে ক্ষীরপুলীর পয়সা হয়তো তা হইলে না দিলেও চলিবে।

পরের দিন লক্ষ্মীকে সঙ্গে করিয়া নিবারণ যখন আসিল হরিহর কবিরাজ তখনও ডিস্‌পেন্‌সারীতে ফিরে নাই। ভোরের রুগী দেখা সারিয়া ফিরিতে তার দশটা কোনদিন বা এগারটাও বাজিয়া যায়। লক্ষ্মীকে লইয়া নিবারণ বেঞ্চির উপর বসিল।

ঢব্‌ঢবে পেটওয়ালা টিঙ্‌ টিঙে একটা মেয়ে কোলে করিয়া নিবারণ আসিবে—কাল বলিবার সময় সে-রকম একটা ধারণাই সুরেশের মনে ছিল। ডুরে-শাড়ী-পরা গোলগাল ষোল-সতেরো বছরের একটি মেয়েকে দেখিয়া সুরেশ যেন থ বনিয়া গেল, এই নিবারণের মেয়ে! রঙটা ফরসাপানা হইলে যে ঠাক্‌রুণের মত দেখাইত। হুবহু নিবারণের চেহারা! নিবারণকে তো কুচ্ছিত দেখায়: তার ওই চৌকা চওড়া মুখের আদলকে নরম মাংস দিয়া নারী করিয়া গড়িলে যে এত ভাল লাগিতে পারে, না দেখিলে সুরেশ যেন বিশ্বাস করিত না।

সুরেশের চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল: বহ নিবারণ বাই, তামুক আনি। সে ঘড়ির দিকে চাহিল: দশটা বাইজা গেছে, আইসা পড়লো বুইলা কবিরাজ মশয়।

দেরির আশঙ্কা করিয়া নিবারণ চলিয়া যাইতে না চায় সে-আন্দাজ ভরসা দিয়া সুরেশ ভিতরে গেল তামাক আনিতে।

ফরাসের একপাশে একটা নীচু ডেস্কের পিছনে পুরু ছোট একখানি তোষক; কবিরাজ মশায়ের অনুপস্থিতিতে অম্বিকা তা'তে জাঁকিয়া বসিয়া অধ্যয়ন করে। মুখে ও স্বরে চিকিৎসকের গাম্ভীর্য্য আনিয়া সে নিবারণকে জিজ্ঞাসা করিল: বিষয় কি, কি ব্যারাম?

—ব্যামো দাদাবাবু প্যাটের বিষ, প্যাট কাম্‌ড়িতে এক এক দিন পইড়া কাৎরায়।

—হুঁ, দেখি,—অম্বিকা ভারিক্কি চালে হাত বাড়াইল। কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া চার আঙুলে নাড়ী টিপিল, তারপর সুপুষ্ট স্বাস্থ্যবতীর চোখের নীচের পাতা টানিয়া রক্তের পরিমাণ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিয়া এ-দৃশ্য দেখিয়া সুরেশের গায়ে জ্বালা ধরিয়া গেল। কলকেয় ফুঁ থামাইয়া সে কহিল: থোও থোও, তোমার পোদ্দারী করতে অইবো না।

—ছাখ সুরেশ···অম্বিকা ভ্রূকুটি করিয়া তাকাইল।

—ইস্, দুই চোখ য্যান বিষের ডালা, তোমার ঐ বিষে আমারে ধরবো না, হ!

ব্যাপারটা হয়তো আরও গড়াইতো, কিন্তু ছাতা কাঁধে কবিরাজ মশায়ের মূর্ত্তিটি দরজার কাছে দেখা দেওয়ায় অল্পেতেই থামিয়া গেল।

টিনের ফ্রেমে বাঁধানো সস্তা দামের ছোট্ট একখানা আয়না তিনচার টুকরায় ফাটিয়া কোনো প্রকারে টিঁকিয়া আছে, তারই সামনে বসিয়া সেদিন সন্ধ্যায় সুরেশ টেড়ি কাটিতেছিল। চিড়-খাওয়া আয়নায় মুখটা বাঁকাট্যারা, চোখ ও নাক সংখ্যায় কয়েকটা বেশী-ই দেখাইতেছিল: মুখের মালিকের মুখের অভিব্যক্তিতে তার বিপক্ষে কোন নালিশ ফুটিয়া ওঠে নাই, বরং আঁচড়ানো স্থগিত রাখিয়া বিভিন্ন রকম মুখভঙ্গি সহকার নিজেকে সে নিরীক্ষণ করিতেছিল। অশিক্ষিত অপরিণত মন লইয়া আয়নার সম্মুখীন হওয়া আজও মানুষ জীববিশেষের অনুরূপ মুখভঙ্গি না করিয়া পারে না।

কবিরাজ মশায়ের নিকট হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া চুল ছাঁটিবার পয়সাটা সুরেশ সংগ্রহ করিয়াছিল; মাথায় তার দশ আনা-ছ'আনা ছাঁট। ষোল আনা লোকের মাথায় দশ আনা-ছ'আনা তাই ওটা শিরোধার্য্য হইয়া গিয়াছে—হরিহর কবিরাজের চোখেও আর বাধে না। তৈলভারাক্রান্ত চুলগুলিকে আঙুলের চাপে ফুলাইয়া বাঁকাইয়া সুরেশ মনের মত করিয়া সিঁথি কাটিল, পুঁটুলি খুলিয়া কুঁচকানো একটি খাটো সার্ট গায়ে চড়াইল, পায়ে দিল অম্বিকার পরিত্যক্ত ধূলিমাখা একজোড়া স্যাণ্ডেল। তারপর গোপনে কাগজের একটা পুরিয়া পকেটে রাখিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

নিবারণের বাড়ী পৌঁছিয়া সুরেশ ডাকিল: নিবারণ বাই!

—আহরে বাই, ভিতরে আহ··একথান্ পিড়ি দে তো লক্ষ্মী।

দাওয়ার উপরে লক্ষ্মী পিড়ি পাতিয়া দিল, সুরেশ বসিয়া পুলিন্দাটা নিবারণের হাতে দিয়া বলিল: তামুক খাওয়াও দেখি।

বড় রকমের একটা ঘরের আন্দাজ জায়গার মধ্যে নিবারণের বাড়ী, তারই ভিতর দু'খানি দোচালা, চারখানি চারচালা ঠেলাঠেলি করিয়া কোনো প্রকারে দাঁড়াইবার স্থান করিয়া লইয়াছে। এক এক করিয়া তিন ছেলের বিবাহ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সংখ্যাও নিবারণকে বাড়াইতে হইয়াছে, তার উপর আবার বড় দুই পুত্র পিতার সঙ্গে কলহ করিয়া এই পরিসরের ভিতরেই যার যার পৃথক পাকের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

তামাক টানিতে টানিতে সুরেশ প্রশ্ন করিল: পোলারা কে কি কাম করে?

—বড় পোলা ইস্কুলের দপ্তরী, পরের জন দিছে পানের দোকান, আরেক জন আমার কামই করে। ছোট্‌টার কামে মন নাই, বিয়াটা দিয়া লই আপনেই মতি অইবো।

মায়ের কথা সুরেশের মনে পড়িয়া যায়, তার মাও ঠিক এই কথাই বলিত। মা জীবিত থাকিলে এতদিন বিবাহ করিয়া সে গ্রামের বাড়ীতে ঘর-সংসারী হইয়া পড়িত। কবিরাজী তাহার ভাল লাগে না। দু'বছর পার হইয়া গেল, কি সে শিখিয়াছে, কি তার শিখিতে হইবে আজ অবধি বুঝিতে পারিল না।

—বাখরখানির কামে পাও কেমন? সুরেশ জিজ্ঞাসা করে।

—দোকানী দেয় টাকায় চাইর আনা...কোন দিন দুই আনা, কোন দিন ছয় আনা, এর কি ঠিক আছে রে বাই।

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া লক্ষ্মীর হাতের পান মুখে পুরিয়া সুরেশ উঠিয়া পড়িল। তার মাথায় নূতন ভাবনা আসিয়া স্থান লয়। কবিরাজী ছাড়িয়া ফেরির কাজ করিলেই বা মন্দ কি, দু'পয়সা তাতে রোজগার হইবে। তখন লক্ষ্মীর মত একটি মেয়ে দেখিয়া—লক্ষ্মীই বা নয় কেন: লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া উহাদের সঙ্গে ঐ রকম একটি চালাঘরে সংসার পাতিয়া বসিলে বেশ সুখে শান্তিতে সে দিন কাটাইতে পারে।

ইহার পর হইতে সুরেশ প্রতিদিন রাত্রে কাজ সারিয়া যায় নিবারণের বাড়ী; কিছুক্ষণ বসিয়া তামাক টানিয়া গল্প করিয়া ফিরিয়া আসে। নিবারণের ছোট ছেলে নিতাইর সঙ্গেও পরিচয় হইয়াছে। ছেলেটা টেরি কাটিয়া হাঁটুর নিচু অবধি রঙিন পাঞ্জাবী ঝুলাইয়া চক্‌চকে চোখা-পামসু পায়ে এক-এক দিন সন্ধ্যায় আসিয়া সুরেশকে ধরিয়া বসে একগুলি মোদকের জন্য। সুরেশ দিতে পারে না বলিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায়। ছেলেটার চরিত্তির ভাল নয় নিবারণের মুখেই সুরেশ শুনিয়াছে—তবু সে লক্ষ্মীর ভাই। অম্বিকার চোখের সামনে মোদক সরানোর মত কঠিন কাজটাও সে আজ তার জন্য করিয়াছে। বস্তুটা সময় মত পৌঁছাইয়া দিতে নিতাই বাহির হইবার পূর্ব্বেই সুরেশ আসিয়া নিবারণের বাড়ী উপস্থিত হইল।

কেরসিনের ডিবার আলোয় বাঁশের-মাচাঙে-পাতা তেলচটা বিছানার উপর আয়না রাখিয়া নিতাই জমিদারী পোষাক করিতেছিল, মোদকের ডেলাটা হাতে পাইয়া মুখ-চোখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, বহ সুরেশদা, তোমারে একটা সিগারেট খাওয়াই।

—সিগারেটে কাম নাই···বুড়া বাপের পয়সায় বাবু সাজতে লয়জ্জা করে না? এমন সাইজা-গুইজা যাও কই?

নিতাই শুধু মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসে। সুরেশ বলে: একটা কুমাণ্ড অইছ।

অম্বিকা সামনের বাড়ীর দিকে চাহিয়া ঝিমাইয়া-ঝিমাইয়া বড়ি পাকায়, সুরেশ হাতের পেশী কাঁপাইয়া হামান-দিস্তা ঠোকে আর লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিবার স্বপ্ন দেখে।

এক মাস কাটিয়া গেল, বলি-বলি করিয়া কথাটা সুরেশ নিবারণের কাছে পাড়িতে পারে নাই। ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া প্রস্তাবটা তুলিবার উদ্দেশ্যে সুরেশ সেদিন কথায়-কথায় নিবারণকে বলিল: এউক্কা মাইয়া দেইখা দেও না নিবারণ বাই, বিয়া করুম।

—বিয়া! হোন কথা। কামকম শিখা পয়সা কামাও, তবে না বিয়া।

—কবিরাজী ছাইড়া ফেরির কাম লইমু মন করছি।

—হ, কি না কথা কও। তুমি হইলা ভদ্দরলোকের পোলা, তোমার নি এই কাম সাজে। কবিরাজ হইয়া পয়সা ঘরে আন, মানুষ হও, তারপর না সংসার করবা। ভদ্দরলোকের পোলার বিয়া কি করুম কইলেই অয়। ...হ, ভাল কথা, লক্ষীরে আইজ দেইখা বুড়া-পুর পাকা কথা দিয়া গেল। পোলা কারখানায় কাম করে। এই মাসেই কাম সারুম...সোমত্ত মাইয়া, ঘাড়ের বোজা, নামলেই রক্ষা, কি কও?

সুরেশ কহে না কিছুই। হুঁ-হাঁ করিয়া কিছুক্ষণ পর নিরাশ ভারী মন লইয়া বাহির হইয়া আসে। লক্ষ্মীরও তবে বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। না হইলেই বা তার কি লাভ ছিল; ভদ্রলোকের ছেলে সে, মানুষ হইবার জন্য অপেক্ষা তাকে করিতে হইবে। নিবারণ যথার্থ কথাই বলিয়াছে, ভদ্র সন্তানের কি করিব বলিলেই বিবাহ করা চলে! কবিরাজ মশায়ের বড় ছেলে এম-এ পাশ করিয়া মানুষ হইবার জন্য ঘুরিয়া মরিতেছে; অম্বিকা সুরেশের পাঁচ বছরের বড়, বিদ্যা-বুদ্ধিও তার বেশী, যদিও অম্বিকার সামনে এ কথা সে মরিয়া গেলেও স্বীকার করিবে না—তবু কথাটা তো সত্যি, সেই অম্বিকাও মানুষ হইবার আশায় অপেক্ষা করিয়া আছে। আচ্ছা, অম্বিকা যে সব সময় উল্টা দিক্‌কার বাড়ীর দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে, তার মনেও কি তার-ই মত অসোয়াস্তি!

দিন কয়েক সুরেশের মনটা ভাল গেল না। বিশেষ করিয়া কেবল যে লক্ষ্মীর জন্য তা নয়, নিকট বা সুদূর ভবিষ্যতে আশা করিবার মত কিছু খুঁজিয়া না পাওয়াটাও মস্ত একটা কারণ। কবে কেমন করিয়া সে মানুষ হইবে, মানুষ হইয়া ভদ্রলোকের মত সংসার পাতিয়া বসিবে, ভাবিতে গিয়া চিন্তাগুলি তার ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

আর কয়েকটা দিন পরে লক্ষ্মীর বিবাহ, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা হয়তো তেমনি করিয়া গোল হইয়া বসিয়া গান ধরিবে: 'কপালে সিন্দুর পায়েতে আলতা,'—লক্ষ্মীকে একটা কিছু উপহার দিতে ইচ্ছা হয় সুরেশের; পিসী মরণীকে দিয়াছিল সিন্দুর ও আলতা, বিবাহে ওরকম কিছু-ই তো দেওয়া উচিত—কিন্তু পয়সা!

সেদিন সন্ধ্যায় অম্বিকা গেল তার এক আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে, কিছুক্ষণের জন্য সুরেশের হাতে পড়িল আলমারির চাবি। চার তোলা মোদক বিক্রি করিয়া পয়সাটা সে আর জমা দিল না, শেষের দিকে হিসাবে ধরা পড়িলে তখন দেখা যাইবে। পয়সা চার আনা সে লুকাইয়া রাখিল লক্ষ্মীর জন্য সিঁদুর ও আলতা কিনিবে বলিয়া।

সংসার করিবার আশা সুরেশ ত্যাগ করিয়াছে, সে বুঝিয়াছে আরও অনেক, অনেক দিন তাকে এভাবেই কাটাইতে হইবে। নিঃসীম নিরাশায় মনটা যেন তার ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। অম্বিকা ফরাসের উপর আলোর কাছে বসিয়া পুরানো বিলিতি একটা পোষাকের ক্যাটলগে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সন্ধানী চোখে মেমসাহেবের ছবি দেখিতেছিল, সুরেশ হুঁকা হাতে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পলকহীন দৃষ্টিতে খোলা পাতাটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে গিয়া রাস্তার ধারের রোয়াকে আব্‌ছা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন হুঁকায় টান দিতে লাগিল।

সুরেশের কাছে আসিয়া যে থামিল সে নিতাই। গলার স্বর নীচু করিয়া কহিল, সুরেশদা: আইজ একটা তোলা মোদক বাই দিতেই অইবো।

—পয়সা ফ্যালাও, সুরেশ ত্যক্ত হইয়া জবাব দিল।

নিতাই বলিল: পয়সা ফালাইলে আর তোমারে খোসামুদ করুম ক্যান্।

হঠাৎ স্বর নরম করিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল: মোদক লইয়া রোজ রোজ যাও কই?

—হেই এক কথা, যাও কই! সখ জাগে তো আহ না দেখবা কই যাই।

সুরেশ কোন প্রতিবাদ না করায় অনুরোধের সুরে নিতাই ফিস্‌ফিস করিয়া বলিল: পয়সা-টয়সা আছে কিছু·····দুই গুলি মোদক লইয়া চল না, যাইবা?

—মোদক লওন যাইবো না, অম্বিকা আছে। তোমার লগে·····থামিয়া সুরেশ ঘন ঘন হুঁকায় টান দিতে লাগিল, চট্ করিয়া হুঁকাটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিল: গাছতলায় গিয়া খারও নিতাই। বলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

আলমারির তলায় লুকানো পয়সা চার আনা সন্তর্পণে বাহির করিয়া সুরেশ কোমরে গুঁজিল, তারপর সার্টটা কাপড়ের খুঁটে জড়াইয়া অম্বিকার সাম্‌নে দিয়া ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সহরতলী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

দুই

সহরতলীর রূপান্তর গ্রহণের প্রক্রিয়া দিন দিন দ্রুততর হইয়া উঠে।

অদ্ভুত ব্যাপার কিছু নয়, তবু আশ্চর্য্য মনে হয়। মাটির বাসন যেন দেখিতে দেখিতে কৃত্রিম ধাতুতে দাঁড়াইয়া যাইতেছে আর চাকচিক্য বাড়িতেছে প্রতিদিন। কত এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো রাস্তা নূতন পিচের আবরণে গা ঢাকিয়া ঝক্‌-ঝক্‌ করিতেছে, কত আঁকা বাঁকা সরু গলি চওড়া আর সিধা হইয়া যাইতেছে, কত অনামী পথের গায়ে আঁটা হইয়া যাইতেছে জম্‌কালো নাম। চারিদিকে বাড়ী উঠিতেছে অসংখ্য। ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো সেকেলে ধরণের সাদাসিদে একতলা দোতলা অনেক বাড়ী অদৃশ্য হইয়া সেখানে দেখা দিতেছে আধুনিক ফ্যাসানের বাড়ী—শুধু গঠনের মধ্যেই কত কায়দা। এ অঞ্চলে ছোট বড় সব বাড়ীরই প্রায় আকার ছিল চার-কোণা বাক্‌সের মত, এখন বাড়ীগুলি হইয়াছে ইঁট কাঠ চুন সুরকি সিমেণ্ট লোহার জ্যামিতি। অস্বাভাবিক রূপলাবণ্যের অপ্রত্যাশিত আঘাতে বাড়ীগুলি যেন দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। শিল্পী ভাস্কর কি মিস্ত্রীর কাজ আরম্ভ করিয়াছে, তাই তাল সামলানো যাইতেছে না?

দোকানপাটের সংখ্যাও হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, চেহারাও বদলাইয়া যাইতেছে। ছোট ছোট কত পুরানো দোকান যে উঠিয়া গেল!—ছোট অপরিচ্ছন্ন ঘরে এলোমেলোভাবে জিনিষ সাজাইয়া এতদিন যাদের কাছে বিক্রী করা চলিত তাদের অনেকেই তো নাই, নূতন যারা আসিয়াছে তারা ছবির মত সাজানো দোকান চায়। বড় রাস্তায় রাস্তার আলোর সংখ্যা আরো জোর বাড়িয়াছে বটে কিন্তু এখন দু'দিকের দোকানের আলোতেই রাস্তাটি এমন ঝলমল করে যে, রাস্তার আলো রাত বারোটা পর্য্যন্ত নিভাইয়া রাখিলেও চলে। বাজারের সংস্কার হইয়াছে। এলোমেলোভাবে যেখানে সেখানে কেউ আর মাছ তরকারী বেচিতে বসে না, সন্ধ্যার পর বাজারের অর্দ্ধেকটা এখন আর আব্‌ছা অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় না। দু'বেলা ধোয়া-মোছার ব্যবস্থা করিয়াও অবশ্য বাজারের নোংরামি আর দুর্গন্ধ এখনও দূর করা যায় না, কোনদিন যাইবেও না, তবু কুলীর দেহের ভদ্রলোকের দেহে পরিণত হওয়ার মত, বাজারের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাতে সন্দেহ নাই।

দলে দলে যে-সব নর-নারী আসিয়া এ অঞ্চলের নূতন ধরণের বাড়ীগুলিতে নীড় বাঁধিতেছে সহরতলীর পরিবর্ত্তিত আবেষ্টনীর সঙ্গে তাদের চাল-চলন বেশভূষা বেশ খাপ খায়। অনেকে বাস করিতে আসিয়াছে নিজের বাড়ীতে, অনেকে আসিয়াছে ভাড়াটে হইয়া। জমির

দাম এত বাড়িয়া গিয়াছে যে বড়লোক ছাড়া বাড়ী করিয়া এ-অঞ্চলে বাস করা আর সম্ভব নয়। প্রথমদিকে যারা জমি কিনিয়া বাড়ী করিয়াছিল, তৈরী বাড়ী কিনিয়া নিয়াছিল, তারা প্রায় অধিকাংশই না-বড়লোক ধরণের ধনী, বাড়ী করিতেই হয়ত অনেকের জীবনের সঞ্চয় ফুরাইয়া গিয়াছে। তবু এরাই প্রথমে এই সহরতলীকে ফ্যাশনেব্‌ল সহরে রূপ দিয়াছে, এ অঞ্চলে বাস করার মর্য্যাদা ও সুবিধা বাড়াইয়াছে, আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর আসিয়াছে বড় বড় চাকুরে ব্যবসায়ী জমিদার—দশগুণ কম দামে পাঁচ কাঠা জমি কিনিতে একদিন যাকে চোখে অন্ধকার দেখিতে হইয়াছিল তার ছোট বাড়ীখানার পাশে উঠিয়াছে বাগান-ঘেরা প্রাসাদ।

অনেক বস্তির চিহ্নও লোপ পাইয়াছে, কেবল যেগুলি বড় রাস্তার অনেক তফাতে ভদ্র পাড়ার পিছনে পড়িয়াছে সেগুলি টিঁকিয়া আছে,—কোনটা সম্পূর্ণ, কোনটা আংশিক। যশোদার বাড়ীর তিনদিকে নতুন বাড়ী উঠিয়াছে, কেবল কুমুদিনীর বাড়ী যেদিকে সেদিকটা আগে যেমন ছিল তেমনি আছে। রূপান্তরের ঢেউ যশোদার মুখোমুখি বাড়ী দু'টিতে আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে।

যশোদা বাড়ী দু'টি বিক্রী করিলে সঙ্গে সঙ্গে এদিকের আট দশখানা বাড়ী পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইত। বিক্রী করিবার জন্য এসব বাড়ী আর ফাঁকা জমির মালিকেরা সকলেই উৎসুক হইয়া আছে, এ অঞ্চলে জমির দাম যে এত চড়িতে পারে পাঁচ সাত বছর আগে কেহ ভাবিতেও পারে নাই। সব বেচিয়া দিয়া সহরের আরও তফাতে সস্তায় জমি কিনিয়া আবার তারা বাড়ী-ঘর তৈরী করিয়া নিবে, একটা মোটা টাকা হাতে থাকিয়া যাইবে। এখন তাদের ভয় শুধু এই, হঠাৎ জমির দাম না কমিয়া যায়।

কিন্তু যশোদার জন্য কেউ তারা বাড়ী বিক্রী করিতে পারিতেছে না। যে কোম্পানী সমস্ত পাড়াটা চড়া দামে কিনিতে চায়, মাঝখানে যশোদার বাড়ী দু'টি বাদ পড়িলে তারা বেশী দাম দিবে না। সকলেই যদি বেচিতে রাজী হয়, এক কাঠা জমিও বাদ না পড়ে, তবেই যশোদার বাড়ীর এপাশের জমির দরটা তাদেরও দেওয়া চলিতে পারে—নয়তো অত-দামে ছাড়া-ছাড়া জমি কিনিয়া কোম্পানীর কি লাভ হইবে?

বাড়ীর মালিকেরা একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়াছে, যশোদাকে বুঝাইয়াছে, অনুরোধ করিয়াছে, ভয়ও দেখাইয়াছে। কুমুদিনী যে কত খোঁচাইয়াছে বলিবার নয়। কুমুদিনীর বাড়ীটি ছোট কিন্তু যায়গা অনেক। বাড়ীর পিছনে তার একটি বাগান আছে, পেয়ারা লেবু ডালিম গাছে বাগানটি ঠাসা। অনেকগুলি টাকা হাতে পাওয়ার সখটা কুমুদিনীর বড় প্রবল। টাকা হাতে পাওয়ার সখটা অবশ্য কারও কম থাকে না, কিন্তু কুমুদিনীর মনটাই বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী ছট্‌ফট করিতেছে।

তারপর মনে একটা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া যশোদা যদি বা বাড়ী দু'টা বিক্রী করিতে রাজী হইয়াছিল, শেষ মুহূর্ত্তে আবার তার মত বদলাইয়া গেল।

সবচেয়ে বেশী গোলমাল করিল কুমুদিনী।

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে একা এক বাড়ীতে থাকার জন্যও বটে, বাড়ী বিক্রী করিতে অস্বীকার করার জন্যও বটে। প্রথম কারণটা নিয়া সকালবেলা ঘণ্টা দুই ঝগড়া করিয়া ফুঁসিতে ফুঁসিতে বেচারী সবে বাড়ী গিয়া রান্না চাপাইয়াছে, অন্য ব্যাপারটা কানে আসিল। হাঁড়ি নামাইয়া আবার সে ছুটিল যশোদার কাছে।

'এটা কি শুন্‌ছি চাঁদের-মা সই? বাড়ী নাকি তুই বেচবি না?'

যশোদা উনানে হাঁড়ি চাপাইতেছিল, সংক্ষেপে জানাইল 'উঁ হুঁ।'

'কেন শুনি? তোর একার জন্য সবাই মরব আমরা? আমরা তোর কি করেছি, নিজের ক্ষতি ক'রেও আমাদের সব্বোনাশ করবি? তুই কি পাগল নাকি চাঁদের-মা সই, মাথা কি তোর খারাপ?'

কত কথাই যে কুমুদিনী বলিয়া যায়। যশোদা বেশীর ভাগ সময় চুপচাপ শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্য করে। এইমাত্র ঝাড়া দু'ঘণ্টা ঝগড়া করিয়া গিয়া কুমুদিনী বোধ হয় একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, প্রথমদিকে কথাগুলি তার তেমন ঝাঁঝালো হয় না। তারপর ক্রমে ক্রমে মেজাজ চড়িতে থাকায় সে যশোদার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করিতে থাকে। মনে হয়, এতকাল সে বুঝি শুধু যশোদার দোষের অফুরন্ত তালিকা মুখস্ত করিয়া কাটাইয়াছে, যশোদার মত খারাপ মেয়েমানুষ যে জগতে আর দু'টি নাই এ কথাটা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না।

শেষে যশোদা বলে, 'এদিকে তুই তো আলাপ করছিস আমার সঙ্গে, আরেকজন যে না খেয়ে কাজে গেল?'

'যাক্। আরেকজনের জন্য তোর অত দরদ কেন শুনি?'

'পীরিতের মানুষটার জন্য দরদ হবে না?'

কুমুদিনী মুখ বাঁকাইয়া বলে, 'তা তামাসা আর করছো কেন? পীরিত যে তোমাদের ঢের দিন থেকে চলছে তা কি আর জানিনে আমি।'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'কত গণ্ডা লোকের সঙ্গে যে তুই আমার পীরিত ঘটিয়ে দিলি ভাই! কিন্তু আমার এমনি পোড়াকপাল—'

কুমুদিনী ফোঁস করিয়া একটা অতি কুৎসিত মন্তব্য করিয়া নিজেই একটু থতমত খাইয়া যায়—কথাটা তার নিজের কানেই বীভৎস শোনায়। এতক্ষণ চটে নাই কিন্তু এবার যশোদা চটিয়া উঠিবে ভাবিয়া কুমুদিনীর একটু ভয়ও বুঝি হয়। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া নিয়া নরম গলায় সে অন্য কথা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, কেন বাড়ী বেচবি না বল্‌তে তো দোষ নেই ভাই চাঁদের-মা সই?'

আশাপূর্ণা দেবী
৪৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

কুমুদিনীর অকথ্য মন্তব্যে যশোদা রাগ করিয়াছে কিনা বোঝা যায় না, কেবল মুখখানা তার একটু গম্ভীর দেখায়। একটু ভাবিয়া সে বলে, 'না, বল্‌তে আর দোষ কি। সত্যপ্রিয় কিনে নিচ্ছে তো ঘর-বাড়ী—ওকে আমি বেচব না, লাখ টাকা দিলেও নয়।'

'সত্যপ্রিয়বাবু তো কিনছে না? একটা কোম্পানী থেকে কিনছে।'

'ওটা সত্যপ্রিয়ের কোম্পানী। লোকটা আমার ঘর ভেঙ্গেছে, আমার বদনাম রটিয়েছে, ওকে আমি বাড়ী-ঘর বেচব? সবাই কত ভালবাসত আমায়, এখন একজন আসে দেখিস্ আমার কাছে? কত করেছি ওদের জন্যে আমি, আজ ওরা আমায় বল্‌ছে সত্যপ্রিয়ের লোক, সত্যপ্রিয়ের টাকা খেয়ে ওদের বন্ধু সেজে ওদের সর্ব্বনাশ করেছি।'

এভাবে কোন বিষয়ে নালিশ করা, অভিমানে এভাবে বিচলিত হওয়া যশোদার স্বভাব নয়। বন্ধুরূপী শত্রু বলিয়া কুলি-মজুরেরা ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া মনটা কি যশোদার নরম হইয়া গিয়াছে?

কুমুদিনী একটু ভাবিয়া বলে, 'তা এক দিক দিয়ে তো ভালই হয়েছে ভাই চাঁদের-মা সই? কতগুলো কুলি-মজুরদের পাল্লায় পড়ে' যন্ত্রণা পাচ্ছিলে, বেঁচে গেছ। এখন অন্য ভাড়াটে রাখো বাড়ীতে,—না না, ভাড়াটে রাখবে কি ক'রে, বাড়ী তো তুমি বেচে দিচ্ছ।' বলিয়া কুমুদিনী একগাল হাসিল।

কিন্তু যশোদার জীবন সে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। যখন তখন যশোদার কাছে ছুটিয়া আসে, মত বদলানোর জন্য ঝগড়া করে, অভিশাপ দেয় আর মিনতি করে, মাঝে মাঝে ধনঞ্জয়কে পর্য্যন্ত মধ্যস্থ মানে।

ধনঞ্জয় দ্বিধাভরে বলে, 'আমি তো বল্‌ছি প্রথম থেকে কিন্তু—'

যশোদা বলে, 'কি মুস্কিল, তোমরা বেচ না তোমাদের ঘর-বাড়ী। আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কি? আমায় নিয়ে টানাটানি করছ কেন?'

যশোদার বাড়ী বেচার সঙ্গে তাদের স্বার্থের সম্পর্ক কোথায়, কেবল কুমুদিনী নয় পাড়ার সকলেই অনেকবার কথাটা তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যশোদা স্বীকার করে না। সে বলে, সব সত্যপ্রিয়ের চাল। সকলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অন্য ক্রেতা আসুক, যশোদার বাড়ীশুদ্ধ কিনিতে পাইলে যে দর সত্যপ্রিয় দিবে বলিয়াছে তার চেয়ে বেশী দর দিয়া তখন কিনিয়া নিবে, যার খুসী বেচিবে যার খুসী বেচিবে না, সত্যপ্রিয় কথাটি বলিবে না।

'জমির দর চড়ছে দেখছ না দিন দিন? বেচবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন?'

কেদারও যশোদার কথায় সায় দেয়—চিরদিন দিয়া আসিতেছে। তবে কুমুদিনীকে জানাইয়া নয়। কুমুদিনীর কাছে সে যশোদার কথার জোরালো প্রতিবাদ করে। তারপর একদিন দেখা যায়, যশোদার কথাই ঠিক। পেন্‌সনভোগী এক ভদ্রলোক কেদারের বাড়ীর পাশে উমে তরফদারের বাড়ীটা এবং ওই ভদ্রলোকেরই এক বন্ধু কানাই নন্দীর এগার কাঠা ফাঁকাশ

জমিটুকু কিনিতে রাজী হইয়া গেল—যশোদা বাড়ী বেচিলে সত্যপ্রিয়ের কোম্পানী যে দর দিবে বলিয়াছিল সেই দরেই। কিন্তু পেন্সনভোগী ভদ্রলোক ও তার বন্ধুর আর এখানে বাড়ী বা জমি কেনা হইল না, বিনা সর্ত্তে সকলের বাড়ী ও জমি সত্যপ্রিয়ই কিনিয়া নিল।

বেচিল না কেবল কুমুদিনী।

এতকাল কয়েক হাজার কাঁচা টাকা হাতে পাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া, যশোদার সঙ্গে প্রতিদিন ঝগড়া করিয়া, শেষ মুহূর্ত্তে সে বাঁকিয়া বসিল। কৈফিয়ৎ দিল এই : 'আরও দাম চড়ুক, তখন বেচব।'

তারপর কয়েকদিন আর যশোদার বাড়ী যায় না। কেদারের কাছে খবর পাইয়া যশোদা নিজেই তাকে দেখিতে গেল। কুমুদিনীর সাতবছরের ছেলেটাকে এক হাতে ধরিয়া কাঁধে তুলিয়া বলিল, 'কি হ'ল ভাই কুমুদিনী সই, বাড়ী যে বেচলি না?'

'তুই যে বেচলি না? দাম চড়লে তুই যখন বেচবি, আমিও তখন বেচব।'

'তবে আর তুই বেচেছিস্।'

অনেকদিন পরে আজ যশোদার বড় আমোদ ও আনন্দ বোধ হয়। মানুষকে মানুষ ভালবাসে বৈ কি। সকলে না হোক, নাটকীয় ভালবাসা না হোক, দু'চারজন সত্যই ভালবাসে। কুমুদিনীর অন্তহীন কটু কথায় তার যে একটুও রাগ হয় না, কুমুদিনীকে সে ভালবাসে বলিয়াই তো? তাকে ফেলিয়া একা একা কুমুদিনী যে বাড়ী-ঘর বেচিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে না, কুমুদিনী তাকে ভালবাসে বলিয়াই তো?'

কুমুদিনীর ঘরভরা ছেলেমেয়ের কলরব শুনিতে শুনিতে যশোদার বিরাট দেহটি অবসন্ন হইয়া আসে। কারণটা বুঝিতে না পারিয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। সে তো জানে না মনের মধ্যে গভীর অশান্তির গুরুভার বহিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মুক্তি পাইলে শুধু মন নয় শরীরটাও মানুষের আশ্চর্য্যরকম হাল্কা মনে হয়, শান্তি যেন আসে ঘুমের ছদ্মবেশে। ঘুমের মতই হয়তো অস্থায়ী, কিন্তু এখন যশোদার মনে যে শান্তি আসিয়াছে তার তুলনা হয় না।

ইংরাজী নববর্ষ সুরু হয় শীতকালে। কেদার পরামর্শ দিল, ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিন আবার হোটেল খুলিলে কেমন হয়? কারখানার কুলি-মজুরদের জন্য না হোক, কারখানার বাহিরে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে তাদের জন্য? যশোদারও তো জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে! বিশেষতঃ, ধনঞ্জয়ের মত বিরাটকায় পোষ্য যখন তার জুটিয়াছে।

যশোদা বলিল, 'কিছুদিন যাক।'

কেদারও সায় দিয়া বলিল, 'আচ্ছা যাক কিছুদিন।'

দিন যায়। নন্দ ও সুবর্ণের কোন খবর আসে না। কোথায় কি ভাবে ওরা দিন কাটাইতেছে কে জানে! দিন ওদের চলিতেছেই বা কি করিয়া? নন্দ কি রোজগারের কোন উপায় করিতে পারিয়াছে? অথবা, সুবর্ণের গায়ের গয়না ক'খানা স্যাকরার দোকানে যাইতেছে? নন্দর মত ছেলে, দু'দিন আগেও দিদি মুখে তুলিয়া না দিলে যে প্রায় খাইতেই জানিত না, একটা

মেয়েকে চুরি করিয়া পালাইয়া এতকাল সে যে কেমন করিয়া ব্যাপারটার জের টানিয়া চলিতেছে, ভাবিলেও যশোদা অবাক হইয়া যায়।

মাঝে মাঝে নন্দর কীর্ত্তন শুনিবার জন্য যশোদার বড় জোরালো ইচ্ছা জাগে। কীর্ত্তন করিলেই নন্দর শরীর খারাপ হয় বলিয়া নন্দর কীর্ত্তন করা যশোদা আগে পছন্দ করিত না, যদিও কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সকলের মত অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেগে সেও এক দুর্ব্বোধ্য ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছে চিরদিন। এখন মাঝে মাঝে তার মনে হয়, নন্দ থাকিলে নিজেই নন্দকে গাহিতে বলিয়া একদিন সে ভাল করিয়া তার কীর্ত্তন শুনিত।

জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গে রাস্তায় একদিন যশোদার দেখা হইয়া গেল। একটি নূতন শ্রমিক-সমিতি সভায় যোগ দেওয়ার জন্য যশোদাকে একরকম জোর করিয়া ধরিয়া নিয়া যাওয়া হইয়াছিল, যাওয়ার ইচ্ছা যশোদার ছিল না। সভায় গিয়াই যশোদা টের পাইয়াছিল, তার অনুমানই ঠিক। সমিতিটি খাঁটি শ্রমিক সমিতি নয়, একজন ভদ্রলোক নিজের স্বার্থের জন্য একটি সমিতি গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। সভা শেষ হওয়ার আগেই যশোদা চলিয়া আসিয়াছিল—বাঁচিয়া থাকিতেই যারা মরিয়া আছে তাদের ভাল করার নামে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনের এসব চেষ্টা যশোদা সহ্য করিতে পারে না।

ফিরিবার সময় তার বাড়ীর গলি আর বড় রাস্তার মোড়ের কাছে প্রকাণ্ড তিনতলা নতুন বাড়ীটার সামনে দু'জনে মুখোমুখি হইয়া গেল। বড় বাড়ীটার নীচের অর্দ্ধেকটা অংশ রেস্তোরাঁ, জ্যোতির্ম্ময় বোধ হয় চা খাইয়া ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। এত কাছে বাড়ী জ্যোতির্ম্ময়ের রেস্তোরাঁয় ঢুকিয়া তার চা খাওয়ার কি প্রয়োজন হইয়াছে কে জানে! বাড়ীতে কি জ্যোতির্ম্ময়ের যাইতে ইচ্ছা হয় না, যে-বাড়ীতে একদিন তার একটা বৌ আর একটা বোন ছিল, যে বৌটা মরিয়াছে হাসপাতালে আর যে বোনটাকে চুরি করিয়াছে যশোদার ভাই?

দেখিলেই বুঝা যায়, জ্যোতির্ম্ময় বড় রোগা হইয়া গিয়াছে। যশোদার সঙ্গে কথা না বলিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল, কি ভাবিয়া দাঁড়াইল।

'কোন খবর পাওনি, না?'

যশোদা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

জ্যোতির্ম্ময় আনমনে কি যেন একটু ভাবিল। পথে মানুষ ও গাড়ী-ঘোড়ার সংখ্যা এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে, পথের দু'দিকের চেহারা এত বেশী বদলাইয়া গিয়াছে যে যশোদার মনে হয়, এ বুঝি তার বাড়ীর কাছের সেই পথটি নয়, দূরে অন্য কোথাও আসিয়াছে।

'খবর একটা পাওয়া যাবে চাঁদের-মা, কি বল?'

'তা পাওয়া যাবে বৈ কি। আজ হোক কাল হোক, নিজেরাই একটা খবর ওরা পাঠাবে।'

'তোমায় যদি আগে জানায়, আমাকে জানাবে তো সঙ্গে সঙ্গে? আমায় খবর দিতে হয়তো ওদের ভয় হবে।'

'আপনাকে জানাবো বৈ কি। কিন্তু ওদের সম্বন্ধে আপনি কি করবেন—'

প্রশ্ন শুনিয়াই জ্যোতির্ম্ময় অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, 'সে সব পরে বিবেচনা করা যাবে চাঁদের-মা। নিজের বোনকে তো আর ফাঁসি দেব না আমি?'

আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্যমনে কি যেন ভাবিল জ্যোতির্ম্ময়, তারপর হঠাৎ বলিল, 'একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি চাঁদের-মা। নন্দ কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গেছে, এই কথা বলছো তো সবাইকে?'

যশোদা বলিল, 'হ্যাঁ, ওই ধরণের কথাই বলেছি। পাটনায় একটা চাকরী পেয়েছে। জ্ঞান হবার পর এই বোধ হয় প্রথম মিছে কথা বললাম জ্যোতিবাবু।'

জ্যোতির্ম্ময় খানিকক্ষণ যেন অবাক হইয়াই যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কথা বলিল বড় খাপছাড়া।

'বাহাদুরী কোরো না বেশী।'

গট্‌গট্‌ করিয়া সে চলিয়া গেল। বাড়ীর উল্টা দিকে। গলিতে ঢুকিবার আগে মুখ ফিরাইয়া যশোদা দেখিতে পাইল, আবার সে ফিরিয়া আসিতেছে। আরও কিছু তার বলিবার আছে ভাবিয়া যশোদা একটু দাঁড়াইল, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় তার দিকে চাহিয়াও দেখিল না, সোজাসুজি আগাইয়া চলিয়া গেল।

বাড়ী ঢুকিয়া যশোদা দেখিতে পাইল, নন্দ আর সুবর্ণের বয়সী দুটি ছেলেমেয়ে ভিতরের বারান্দায় জলচৌকিতে বসিয়া আছে। অল্প দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছে ধনঞ্জয়।

যশোদাকে দেখিয়া তিনজনেই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ধনঞ্জয় তাড়াতাড়ি বলিল, 'এত শীগ্‌গির যে ফিরে এলে চাঁদের-মা?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়া যশোদা পাল্টা প্রশ্ন করিল, 'এরা কে?'

'ওরা ঘর ভাড়া নিতে এসেছে। আমি বললাম এখানে ঘর ভাড়া মিলবে না—'

ছেলেটি বলিল, 'কেদারদা' আমাদের বসতে বলে' গেছে। কাছেই বাড়ী না কেদারদা'র?'

যশোদা বলিল, 'হ্যাঁ, কাছেই বাড়ী।'

'কেদারদা' বাড়ী থেকে একটু ঘুরে আসতে গেছে। আমরা থাকলে যদি আপনার অসুবিধে হয়?'

ধবধবে পরিস্কার জামা-কাপড় পরণে, সমস্তই সাদাসিদে সাধারণ, তবু দু'জনের পরিচ্ছদেই যেন মার্জ্জিত রুচি আর সহজ ও স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার ছাপ আঁকা রহিয়াছে। ছেলেটির বয়স তেইশ চব্বিশের বেশী হইবে না, মুখখানা মেয়েদের মত কোমল। মেয়েটির বয়স বোধ হয় বছর ষোল, এলোখোঁপায় আটকানো আঁচলটি খসিয়া পড়ি' পড়ি' করিয়াও পড়িতেছে না, সীঁথিতে সূক্ষ্ম সিঁদুরের রেখা। মুখখানা সুশ্রী, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চপল দুটি চোখ।

এতক্ষণ সে অবাক হইয়া যশোদার বিরাট দেহটি দেখিতেছিল,—জীবনে বোধ হয় সে এতবড় লম্বা-চওড়া মেয়েমানুষ দেখে নাই। এবার ছেলেটির দিকে চাহিয়া অকারণেই ফিক করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি থামো। আমি বুঝিয়ে বলছি।'

ক্রমশঃ

আত্মহত্যার সেতু

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

প্যাসাডেনা শহরে আমাদের বাড়ীর কাছেই একটি সুরম্য সেতু আছে। সেতুটি এক সুবিস্তীর্ণ উপত্যকার উপর তৈরী—দু'পাশে বহুদূর বিস্তৃত ধূসর শৈলশ্রেণী। সেতুটি এত সুন্দর যে দর্শকের বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। যখনই আমি কোন অতিথিকে নিয়ে মোটরে গৃহে আসতাম তখনই ঐ সেতুর উপর গাড়ীর গতি মন্দীভূত করে' বলতাম, "এ সেতু যদি ইটালিতে হ'ত তবে এর খ্যাতি আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ত।" কখনো কখনো উত্তর পেতাম, "তোমাদের প্যাসাডেনার সেতুর সত্যিই তুলনা নেই।"

এর পর দেশে এল দারুণ অর্থসঙ্কট আর তারই ফলে এতদিন যা ছিল আমাদের গর্ব্ব ও আনন্দের বস্তু তা হঠাৎ রূপান্তরিত হ'ল এক নির্ম্মম বিভীষিকায়। সহস্র সহস্র নরনারী যখন বেকার হয়ে দারিদ্র্য-পঙ্কে নিমজ্জিত হ'ল তখন তাদেরই মধ্যে কেউ আবিষ্কার করলে, দুঃখদৈন্য থেকে মুক্তি পাবার সহজ উপায় ঐ সেতু। সেতুটি খুব উঁচু—নীচে উপত্যকার উপর লাফিয়ে পড়লে দুঃখকষ্টের আশু অবসান ঘটবে নিশ্চয়ই। জীবন-যুদ্ধে যারা পরাজিত তারা মুক্তির ঐ পথই বেছে নিলে। দিনের পর দিন অসহায় নরনারীর আত্মহত্যার সংবাদ শহরবাসীর কানে পৌছুতে লাগলো। অবশেষে লস্‌ এঞ্জেল্‌সের এক সংবাদপত্র এই সেতুর বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করলে—কর্ত্তৃপক্ষ যাতে অবিলম্বে সেতুর উপর কড়া পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেন তার জন্যে ঘন-ঘন তাগিদ দিতে লাগলো। কড়া পাহারার ব্যবস্থা নেই বলেই তো লোকে লাফিয়ে পড়তে পারে সেতু থেকে!

কিন্তু এতে ব্যাপার আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। অন্যান্য শহরের হতভাগ্য নরনারী যখন এই সেতুর কথা শুনলে তখন তারাও দুঃখ মোচনের সহজ ও অমোঘ উপায়ের সন্ধানে প্যাসাডেনায় আসতে সুরু করলে। প্রতীকারের পরিবর্ত্তে আত্মহত্যা বরং আরও বেড়েই চললো।

এরপর আবার এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হ'ল। শহরের জন কয়েক ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ঐ সেতুর নীচে পাহাড়ের কোলে বাগানবাড়ী তৈরী করেছিলেন। বাগানের গাছপালার মধ্যে মানুষের দেহ প্রায়ই ছিট্‌কে এসে পড়ায় তাঁদের শান্তির ব্যাঘাত হ'তে লাগলো। তাঁরাও এই অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাতে লাগলেন। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি উপভোগের জন্যেই তো তাঁরা শহর ছেড়ে এই উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছেন। এখানেও যদি উপদ্রব সুরু হয় তবে তাঁরা যান কোথায়? হতভাগাদের যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে! একান্তই যদি আত্মহত্যা করবার দুর্ম্মতি হয়ে থাকে তবে তারা ত অনায়াসে বিষ খেতে পারে বা রেল গাড়ীর চাকার নীচে শুয়ে পড়তে পারে—কিন্তু সে চেষ্টা না ক'রে নির্ব্বোধের মতো তারা লাফিয়ে পড়তে চায় তাঁদের বাগানের মধ্যে! এ বিষয় নিয়ে সর্ব্বত্র আলোচনা সুরু হ'ল এবং এ-আলোচনা চললো প্রায় দু'বছর। ইতিমধ্যে সেতু

থেকে লাফিয়ে পড়ে' মৃত্যু বরণ করলে মোট আশীজন নারী ও পুরুষ। আবার সম্পাদকদের লেখনী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তীব্র অভিযান সুরু করলে।* সমাজ ও রাষ্ট্রের যাঁরা শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক, তাঁরা বিচলিত হ'য়ে পড়লেন,—প্রতীকার চাই, প্রতীকার চাই! চারিদিকের কোলাহলে কর্ত্তৃপক্ষের অবশেষে টনক নড়লো—সেতুর দু'পাশ তাঁরা ঘিরে দিলেন তারের জাল দিয়ে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে আলোচনারও অবসান ঘটলো।

এখন যদি কেউ ঐ সেতুর উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যায় তার মনে হবে যেন সে পুলিশের পেট্রোল-ওয়াগনের মধ্যে বসে' আছে। কোনো অতিথিকে গৃহে আনবার সময় এখন আর আমি ওখানকার মনোরম দৃশ্য সম্বন্ধে কিছুই বলি না, আত্মহত্যা দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যের পরিমাপযন্ত্রবিশেষ—এ-সম্বন্ধে সুধু একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করি।

প্যাসাডেনার সেতু সম্বন্ধে যখন আলোচনা চলছিল তখন একটি বিষয় লক্ষ্য করেছিলাম। সেতু-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার সময় কেউই এ কথা একবারও উল্লেখ করেনি যে অনর্থের কারণ হয়তো সেতু নয়, অনর্থ ঘটিয়েছে সমাজ যা আড়াই কোটি নরনারীর অন্ন-সংস্থানের কোনরূপ ব্যবস্থা করেনি। কোনো সংবাদপত্রেরই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বা সম্পাদককে লিখিত কোনো পত্রে একবারও এ-প্রশ্ন কেউ তোলে নি, কেন লোকে আত্মহত্যা করবার জন্যে হঠাৎ এমন উৎসুক হয়ে উঠলো। একবারও কেউই বলে নি এই সব হতভাগ্য নরনারীর জীবনের গতি ভিন্ন দিকে পরিচালিত করা যেতে পারে—তাদের মনন-ক্রিয়ার এমন পরিবর্ত্তন সম্ভব যা'তে তারা সেতুর উপর উঠে মরণের সন্ধান না করে' আর পাঁচজনের মতোই চতুর্দ্দিকের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হবে। কেউই এ-প্রস্তাব করে নি যে সামাজিক ও আর্থিক কারণগুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া কর্ত্তব্য—সাধারণের আর্থিক অবস্থা ও মনের কি এমন পরিবর্ত্তন হ'ল যাতে এই অল্প সময়ের মধ্যে আশীজন নরনারী সেতু থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করার প্রয়োজন বোধ করলে।

আমাদের দেশ—আমেরিকা—পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সমৃদ্ধ দেশ। প্রত্যেক নাগরিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যা-কিছু প্রয়োজন সবই এখানে আছে। উর্ব্বরা ভূমি আছে, উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি আছে আর আছে প্রায় চার লক্ষ সুদক্ষ শ্রমিক! অবশ্য খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাব ছাড়া আত্মহত্যার অন্যান্য কারণ থাকতে পারে। কত লোক উন্মাদ হয়ে বিচার-শক্তি হারিয়েছে, কত লোক জীবনে বীতস্পৃহ হয়েছে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে, প্রণয়ের ব্যাপারে ব্যর্থকাম হয়ে কত লোক মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করছে—এ সবই হ'ল মানসিক সমস্যা এবং মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়। কিন্তু সেতু থেকে পড়ে' যে আশীটি আত্মহত্যা ঘটেছে তাদের অধিকাংশের কারণ আর্থিক দুর্গতি। এ সুধু অনুমান নয়, কারণ অর্থসঙ্কট দেখা দেবার পর থেকেই ব্যাপকভাবে আত্মহত্যার এই হিড়িক এসেছিল। তা ছাড়া সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে আত্মহত্যার যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাও এ ধারণার সমর্থন করে।

কিন্তু যদিও অভাব-অনটন মুখ্যত আত্মহত্যার কারণ তবু ও-সম্বন্ধে আলোচনা করার

অধিকার আমাদের নেই। আমাদের এই শহরটি ধনী ও যাজকপ্রধান। দেশব্যাপী অর্থসঙ্কটের ফলে মানুষের জীবন কত বিপন্ন হয়েছে এ-সম্বন্ধে আমরা বেশী আলোচনা করি কর্ত্তৃপক্ষ এটা পছন্দ করেন না। এ আলোচনা সুধু অবসাদ আনে না, বিপজ্জনকও বটে। কে জানে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে! দরিদ্র ও অসুখী যারা আমরা তাদের ভয় করি, তাদের বিষয় চিন্তা ক'রে মানসিক শান্তি আমরা নষ্ট করতে চাই না। তাই আমরা আত্মহত্যার কারণ সন্ধান না করে' সুধু সেতুটির শোভাসম্পদ হরণ করেছি—ভেবেছি সেতুটিকে নিরাপদ করতে পারলেই আমাদের কর্ত্তব্যের শেষ।

সমগ্র দেশে যে ব্যাপার চলেছে এটা তারই একটি সঙ্কেত মাত্র। সর্ব্বত্র ঐ একই অসামঞ্জস্য—লক্ষ লক্ষ লোক দুঃখ-দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হচ্ছে আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিলাসের প্রাচুর্য্যে দিন যাপন করছে। প্রকৃত অবস্থা না জানার চেষ্টা, এ-বিষয়ে আলোচনা করার ভয় ও ঔদাসীন্য সর্ব্বত্রই দেখা যায়, তবুও—প্রবল বাধা সত্ত্বেও—আজ সারা পৃথিবীতে ধন-বৈষম্যই সমধিক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

* Upton Sinclair লিখিত Suicide Bridge নামক প্রবন্ধের অনুসরণে।

ঝড়ের আকাশ

বিশ্বনাথ চৌধুরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আর নয়, জয়ন্ত কিছুদিন থেকে মনে মনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ইচ্ছে ক'রেই যাওয়া বন্ধ করেছিল। কিন্তু হেমলতা তাকে মুক্তি দেবেন না, বিরাট মাংসল দেহ নিয়ে এতদূর পর্য্যন্ত যখন তিনি অনুসরণ করেছেন তখন মাঝে মাঝে যে প্রায়ই অনুগৃহীত কর্‌বেন এ রকম আশঙ্কা করা যায়।

জয়ন্ত অনেকটা দমে' গিয়েছিল।

মন্দিরা বল্‌লে, 'কি ভাবছো মেজদা?'

'আমি বরং তোকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বো বেবি—আমার যাওয়া সম্ভব হবে না।'

'বা-রে, তা কী ক'রে হয়—আর তা ছাড়া কালকে রমলার জন্মদিন—উনি বিশেষ ক'রে তোমাকেই যেতে ব'লে গেলেন।' শেষের কথাটা মন্দিরা বেশ জোর দিয়ে উচ্চারণ কর্‌লে।

'তাহ'লে ত আমার কিছুতেই যাওয়া চল্‌বে না।' জয়ন্ত চুরুট আগুন ধরালে।

'কেন তুমি ভয় পাচ্ছ বলো ত?' মন্দিরা প্রশ্ন করলে।

'ভয় পাবো কেন? ভয় পাবার কী আছে।' কৃত্রিম হাসিতে জয়ন্ত অনেকখানি হাল্‌কা হবার চেষ্টা কর্‌লে।

'তবে কেন বল্‌ছো যাবেনা! ওঁরা কত আশা ক'রে থাক্‌বেন—'

'আমাকে দেখে বরং তাঁরা আরও বেশী নিরাশ হবেন।' জয়ন্ত গম্ভীর মুখে জানালার পাশে উঠে এলো।

পথে মন্দিরা শুধু বল্‌লে 'আমি জান্‌তাম শেষ পর্য্যন্ত তুমি যাবে।'

জয়ন্ত পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে' একটু থেমে বল্‌লে, 'কারণ?'

'কারণ তুমি যা ভাবো তা প্রায়ই যবনিকার আড়ালে থেকে যায়, শেষপর্য্যন্ত তুমি যা করো—মনে করো অন্যকে খুসি হ'বার একটা সুযোগ দিচ্ছ—খানিকটা সহানুভূতি, একটা পিঠ-চাপড়ানোর ভাব—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় তুমি তা না ক'রেই পারে না।'

বৃত্তাকারে চুরুটের ধোঁয়া উদ্‌গীরণ কর্‌তে কর্‌তে জয়ন্ত বল্‌লে, 'দেখা গেল কলেজে উঠলে মেয়েরা একটু বাচাল হয়।'

মন্দিরা একটুও বিচলিত না হ'য়ে বল্‌লে, 'এ ক'দিন তোমাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে' আমার এই ধারণা হয়েছে যে তোমার মন—'

'চুপ করবি?' জয়ন্ত ধমক দিয়ে বল্‌লে, 'যা পিছনের সীটে।' জয়ন্ত ব্রেক কস্‌তে যাচ্ছিলো।

৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

মন্দিরা একটু উত্তেজিতভাবে বল্‌লে, 'তুমি আমাকে বাড়ী রেখে এসো—আমি যাবো না।'

'সেই ভাল।' জয়ন্ত গম্ভীরভাবে গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিলে। তারপর সোজা বেলতলা রোড দিয়ে চল্‌তে সুরু কর্‌লে। সামান্য কথার আঘাতও মন্দিরার সহ্য হয় না, একটুতেই চোখে জল আসে—মন্দিরা জানে এ তার দুর্ব্বলতা কিন্তু কিছুতেই নিজেকে ধরে' রাখতে পারে না।

দাদার উপর অভিমানের জন্যে নয়—তাকে এ অবস্থায় দেখ্‌লে মেজদা যে তার দুর্ব্বল মনের ওপরে একটু সান্ত্বনার প্রলেপ দেবে, তাকে আরও বেশী আদর করে' সব ভুলিয়ে দিতে চাইবে এই চিন্তাতেই মন্দিরা যথেষ্ট সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়েছিল। দু' তিনবার পিছন ফিরে সে রুমালের সাহায্য গ্রহণ কর্‌লে—কিন্তু পাশাপাশি ব'সে ফাঁকি দিতেও যেন আরও বেশী লজ্জা।

মন্দিরা বল্‌লে, 'গাড়ীটা একটু থামাও মেজদা, চোখে কী যেন গেল একটা—' ব'লেই সে চোখ দুটো রগড়াতে-রগড়াতে এক মুহূর্ত্তে রক্তিম করে' তুল্‌লে। জয়ন্ত বল্‌লে, 'গাড়ীটা এখানেই থাক, গলির ভিতরে আর ঢুক্‌বে না।' তারপর জয়ন্ত এগিয়ে বল্‌লে, 'আয় না।'

'সন্ধ্যের পর মেয়েদের হস্‌টেলে ঢুক্‌তে দেয় না তা-ও জানো না বুঝি?' একটু থেমে মন্দিরা আবার বল্‌লে, 'এখানকার ঠিকানা যেন কোথায় দেখেছি, কৃষ্ণার কাছে যাচ্ছ বোধ হয়? এই কৃষ্ণা মেয়েটি কে মেজদা?'

'ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।'

'এর বেশী বুঝি বল্‌তে চাও না?'

'না—এর বেশী জানবারও কিছু নেই।'

মন্দিরার চোখে কৌতূহল, ঠোঁটে পাত্‌লা হাসির আভাস; সে বল্‌লে, 'নেই নাকি! মায়ের কিন্তু বিশ্বাস আছে—তিনি বাবাকে যেন সেই কথাই বল্‌ছিলেন।'

জয়ন্ত চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ থেমে গেল—কোথায় যেন খট্‌কা লাগ্‌লো তার,—নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন কর্‌লে, 'কি বল্‌ছিলেন?' গম্ভীর মুখে কথাটা যেন জেরার মত শোনাল।

'বাঃ, আমাকে ধমক দিচ্ছ কেন? সেদিন ফোনে কে যেন ডাক্‌লো—মা ফিরে এসে বল্‌লেন, জয়ন্তর এক বান্ধবী। নামটা তখনই ত শুন্‌লাম।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী—মা বল্‌লেন, ছেলের এখন বিয়ে দেওয়া উচিত। বাবা বল্‌লেন, ভেবে দেখ্‌বো।'

জয়ন্তর পাংশুমুখ প্রফুল্লতায় আবার সতেজ হ'য়ে উঠ্‌লো। 'এর বেশী কিছু হয় নি তাহ'লে?' জয়ন্ত বল্‌লে।

'বেশী হ'লে তুমি বাদ পড়্‌তে নাকি? আমরা ত নেপথ্যে থেকে যতটুকু জান্‌বার তাই জেনেছি।' মন্দিরা একটু হাস্‌লে।

হস্‌টেলের বাইরে থেকেই শোনা গেল শিউজি সুর করে' তুলসীদাস পড়্‌ছে। জয়ন্ত এখানে সকলের কাছেই পরিচিত। শিউজি বল্‌লে, 'দিদিমণি ত, বাহার গিয়া হুজুর।'

'ক'বাজে বাহার গিয়া ?'

'সবির মে' ত গিয়া মালুম থা—' শিউজি একটু ভেবে বল্‌লে।

জয়ন্তকে একা ফিরতে দেখে মন্দিরা বল্‌লে 'দেখা করলে না বুঝি ?'

'ফিরিয়ে দেবার সাহস থাক্‌লে ত বাঁচতাম ; তা নয়, সে হস্‌টেলেই নেই।'

'এত রাত অবধি বাইরে থাকে ?' মন্দিরার বিস্ময়ের পিছনে একটা ধারালো ইঙ্গিত।

'দারোয়ান ত বল্‌লে—সকালেই বেরিয়েছে।'

জয়ন্ত গাড়ীতে start দিলে। হু-হু শব্দে মটর ছুট্‌লো। 'ওকি ! এদিকে কোথায় চল্‌লে ?' মন্দিরা ইচ্ছা ক'রেই ও-কথাটা বল্‌লে।

'যে-দিকে গেলে তুমি খুসি হবে—' জয়ন্ত steeringটা ঘুরিয়ে একটা মোড় ফির্‌লো।

কোমরের যন্ত্রণা নিয়েও হেমলতা উঠে বস্‌লেন। দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে বল্‌লেন—এক হাতে মন্দিরাকে কাছে টেনে নিয়ে হেমলতা বল্‌লেন, 'আমি সেই থেকে তোমাদের কথাই ভাব্‌ছি—মিস্‌সে দে কোথায় ?'

মন্দিরা বল্‌লে 'মা আর বাবা কোথায় ডিনারে গেছেন।'

'তোমরা এসেছ, আমার কত সৌভাগ্য !—আরতি কোথায় ? ওপরের আলোটা জ্বেলে দে ত মা,—এসো, সিঁড়িটা কিন্তু বড় পিছল—' মন্দিরাকে তিনি শক্ত মুঠিতে চেপে ধর্‌লেন। পিছন ফিরে বল্‌লেন, 'জয়ন্ত ত আজকাল ডুমুরের ফুল হয়েছে—তবু ধন্যবাদ, আজকের দিনে মনে করে' এসেছ।'

জয়ন্ত লজ্জিত মুখে একটু হাস্‌লে, একটা কিছু বলবে ভেবেছিল কিন্তু কী আর বলা যায়।

একটা সোফায় হেলান দিয়ে জয়ন্ত বল্‌লে, 'কতদিন আস্‌বো মনে করি—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হ'য়ে ওঠে না।'

হেমলতা একটু হাস্‌লেন। জয়ন্ত আবার আরম্ভ ক'র্‌লে, 'আর তা ছাড়া লাইব্রেরী থেকে ফির্‌তেই সন্ধ্যে হ'য়ে যায়।'

হেমলতা কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য বল্‌লেন 'রমলা ত ঠিক করে' ফেলেছে এবার পরীক্ষা দেবে না,—একেবারে কিছুই তৈরী নেই।' হেমলতার ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট।

জয়ন্ত বল্‌লে, 'একেবারে ঠিক করে' ফেলেছে ? এখনও ত পরীক্ষার অনেক দেরী।'

'কিন্তু ও ত সাহস পায় না—বলে, কিছুই বুঝ্‌তে পারে না।'

জয়ন্ত হেসে বল্‌লে 'এমন মুস্কিল হ'য়েছে আমার হাতেও একটুও সময় নেই। তা নাহ'লে মাঝে মাঝে এসে সাহস দিতে পার্‌তাম।' কথাটা বল্‌তে পেরে জয়ন্ত অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'লো।—হেমলতার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার এর চেয়ে আর কোন সহজ উপায় জয়ন্তের মনে এলো না। হেমলতা যেন কথাটাকে এড়িয়ে গেলেন, অন্য কথার জের টেনে বললেন, 'মেয়েটার খাটুনিরও যেন শেষ নেই, আমি বলি—একটু বিশ্রাম ভাল। একদিকে Leather work, অন্যদিকে কলেজের পড়া—ক'দিক সামলাবে

বলো ! তার উপর ওয়েলস্‌ থেকে অশোক আবার দু'টো নতুন ফরমাস দিয়েছে—ওর কলেজের কোনো বন্ধুর জন্যে একটা 'রাইটিং কেস' আর একটা ব্যাগ্‌।.....যাহোক্‌, ওকেই বা কি বলবো ! কী যে সখ আর খেয়াল ওর ! এদিকে একটুও ছুটি পাবেনা, কিন্তু বাড়ী ফিরে নেশার মতো কাজে লেগে যাবেই। কিছুতেই যেন ওর ক্লান্তি নেই ! অথচ এই নিয়ে যে একটা কিছু করা দরকার সেদিকে ওর মন নেই। আমি ত বলি ওকে, তুই যদি আমার মেয়ে না হয়ে ছেলে হতিস্‌—"

ছেলে হ'লে যে তাকে দিয়ে পৃথিবীর কোন দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করাতেন তা না প্রকাশ ক'রেই হেমলতা চুপ করে' গেলেন।

ভগ্‌লু একটা ট্রে হাতে করে' ঘরে ঢুক্‌লো, পিছনে এলো আরতি। আরতি একটু বেশী চঞ্চল, সব সময় একটা সুশ্রী আবহাওয়া সঙ্গে নিয়ে ফেরে। জয়ন্তর সামনে এসে অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করে' বল্‌লে, 'নমস্কার।'

জয়ন্ত কাপে চুমুক দিয়ে বললে, 'আমিও তাই ভাবছিলাম, এতক্ষণ তোমায় দেখ্‌তে পাইনি—'

হাসির সময় আরতির চোখ দুটো একটু ছোট হয়,—আরতি ব'ল্‌লে, 'দেখবার চেষ্টা করলে দেখ্‌তে পেতেন !' ব্যস্ত ভঙ্গীতে চঞ্চল উচ্ছলতা উপ্‌চে পড়্‌ছে। শাড়ীটা কোমরে শক্ত করে' জড়ানো—দু'এক যায়গায় লেগেছে হলুদের দাগ।

আরতি বল্‌লে, 'মা, চপ্‌টা কী বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে ডিমে ডোব্‌াব, না কড়াইতে দিয়ে তারপর—' হেমলতার কাছে সমস্যাটা কঠিন মনে হ'লো, বাধা দিয়ে বল্‌লেন, 'তুই কী সব নষ্ট করবি না কি, এমন ছেলে মানুষ ! রমলা কোথায় ?'

হেমলতা তাকে কাছে টেনে নিলেন, এলোমেলো চুলগুলো কানের ওপর দিলেন তুলে।

'দিদি ত তোমার সাম্‌নে দিয়েই ওপরে গেল তখন।—শীগ্‌গীর বলো চট্‌পট্‌, তেল ওদিকে জ্বলে' গেলো বোধ হয়—'

'সর্ব্বনাশ ! শেষে সবশুদ্ধ আগুন ধরাবি নাকি ? চল্‌ আমিই যাচ্ছি।'

'Please ! দয়া করে' আমাকে একটু শিখ্‌তে দাও—তার চেয়ে বরং আমি ও'কে সঙ্গে নিচ্ছি।' মন্দিরার হাত ধরে' বল্‌লে, 'এসো না ভাই একটু—I think, we won't spoil the fry'. মন্দিরা প্রতিবাদ করবারও অবসর পেলেনা, আরতি একরকম তাকে জোর করে' টেনে নিয়ে গেল। হেমলতা একটু হাসলেন মাত্র। জয়ন্ত বল্‌লে, 'অনেক পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি।'

'যখন যেমন খেয়াল। ছেলেবেলায় আদরে মানুষ হ'য়েছে, আমিও বিশেষ কিছু বলি না। যতদিন ভুলে থাক্‌তে পারে ! তারপর নিজেই বুঝ্‌তে শিখ্‌বে। রমলাকে কী কিছু বলে' দিতে হ'য়েছে ? তুমি ত সব সময় চোখের সাম্‌নেই দেখ্‌ছো। আমার মেয়ে বলে' বল্‌ছিনা—আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি—'

'তা ত বটেই।' জয়ন্ত ভদ্র ভাবে সায় দিয়ে গেল। আর তা ছাড়া—জয়ন্ত আরম্ভ করেছিলো, তা ছাড়া যে কী,—অনেক ভেবে, অনেক থেমে শেষপর্য্যন্ত জয়ন্ত ঠিক করতে পার্‌লে না।

আর কী ক'রেই বা পারবে! কোন-কিছু মনে করে' ত আর কথা আরম্ভ করেনি—হেমলতাকে খুসি করতে একটা কিছু বল্‌তে চেয়েছিল—ভদ্ররকমের একটা কিছু, যা প্রশংসার মত শোনায়—অন্যমনস্কতায় আর শেষ হ'লোনা। নিজের অপ্রস্তুত অবস্থায় লজ্জিত হ'য়ে জয়ন্ত চুপ করে' গেল।

হেমলতা আরম্ভ করলেন,—কোনরকম ভূমিকা না করে' শান্ত সহজ ভাবেই আরম্ভ করলেন নিকটতম আত্মীয়ের মত—'আমি জান্‌তাম রমলাকে তোমার ভাল লাগে।'

জয়ন্ত একটুও বিস্মিত হ'লোনা। হেমলতা যে এখানেই মোড় ফিরবেন, তাও সে যেন আন্দাজ করে'ছিল। শুধু বল্‌লে, 'রাত অনেক হ'লো বোধ হয়?'

'এখুনি যাবে?' হেমলতা বাইরে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে বল্‌লেন, 'মন্দিরা যদি আজ এখানে থাকে তোমার বাবা রাগ করবেন না ত?'

'কি করে' জান্‌বো?'

'এই ঠাণ্ডায় যাবে—আর ওর শরীরটাও ভাল নেই বল্‌ছে।'

জয়ন্ত একটু হেসে বল্‌লে, 'বাবার ভয়ে ও সব-জায়গায় ও-কথা বলে।'

'এখনকার ঠাণ্ডা বড় খারাপ—তোমার যদি আপত্তি না থাকে—'

'বেশ ত, ও থাক্ না।' জয়ন্ত বল্‌লে।

আরতি সুটকেশ থেকে একটা টেবিলক্লথ বা'র করে' বল্‌লে, 'মা, কৃষ্ণাদি'কেও এই সঙ্গে দাও, ওর আবার হস্‌টেলে ফিরতে রাত হবে।'

'কেন, কৃষ্ণা কি সেই কথা বল্‌ছে না কি!'

'বা-রে, সে কেন বল্‌বে?' আরতি চলে' যেতে যেতে বল্‌লে।

জয়ন্ত উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করলে, 'কৃষ্ণা এসেছে নাকি?'

'আমি যা পছন্দ করি না—সকালে ওকে টেনে আনার কী দরকার ছিল! আর এসেছিল যদি—এতক্ষণ ওকে আট্‌কে রাখা কেন? তুমি ত জানো জয়ন্ত, ও আমার এখানে থেকে কী কেলেঙ্কারিটা করে' গেছে—'

হেমলতার ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট। অনেকদিন আগে নিভৃতে যে-সব কথা উল্লেখ ক'রেছিলেন, সেই দিকে একটু কটাক্ষ করলেন মাত্র।

জয়ন্ত একটু বিপন্ন বোধ করলে একদিক দিয়ে। কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হ'লে তার খুসি হবার কথা—অনেকদিন পরে সে মনে-মনে এই রকম কামনাই করছিল কিন্তু স্থান কাল এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির জটিলতায় সে নিজেকে যথেষ্ট নিরাপদ বোধ করলে না। বরং এখুনি কৃষ্ণার সম্মুখীন হতে হ'লে তাকে যে একটা সঙ্কটময় অবস্থা উত্তীর্ণ হতে হ'বে এই চিন্তায় সে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়েছিল। হেমলতাকে বল্‌লে, 'ওরা কি ওপরে আছে নাকি?'

'কি করে' জানবো বলো!—দু'টিতে এক হ'লে ত আর হুঁস্ থাকে না।'

জয়ন্ত বল্‌লে, 'এইবার তাহ'লে উঠি।'

'সে কি! তুমি যে কিছুই খেলে না?'

'আপনি ত জানেন, অনেক-কিছু খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আরতি দ্রুত পদক্ষেপে ঘরে ঢুক্‌লো। একটু যেন ক্ষুণ্ণভাবে বল্‌লে, 'কৃষ্ণাদি' চলে' গেল মা।'

'না খেয়ে গিয়ে আবার কি বাহাদুরী হ'লো!' হেমলতা যেন একটু স্নিগ্ধ স্বরেই বল্‌লেন।

'আমি কি জানি!' আরতি জয়ন্তর দিকে চেয়ে কি মনে করে' একটু হাস্‌লে।

জয়ন্ত বল্‌লে, 'বেবিকে নিয়ে যেতে হ'লে আবার আমাকে আস্‌তে হবে—ততক্ষণ জেগে থেকো আরতি।'

'একদিন বোন্‌কে কোথাও রেখে থাক্‌তে পারেন না?' ভুরু দুটো একটু সঙ্কুচিত করে' বল্‌লে আরতি। তারপর আবার থেমে—'প্রার্থনা করি, কষ্ট করে' আর যেন আপনাকে ফিরে আস্‌তে না হয়।' আরতি অদ্ভুত ভঙ্গীতে নমস্কার জানালে।

জয়ন্ত চলে' যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই হেমলতার উত্তেজনা বেড়ে গেল। স্বভাবতঃ হেমলতার মেজাজ একটু রুক্ষ, তার ওপর রমলার ব্যবহারে তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন। একটি বারের জন্যও সে যে ইচ্ছা করেই নীচে এলো না—এটা তিনি মনে মনে বেশ বুঝ্‌তে পারলেন।

রমলা কাছে আস্‌তেই একটু কঠিন গলায় বল্‌লেন, 'মা হয়ে আমি তোমার শত্রুতা করতে আসিনি,—এখন বড় হয়েছো, যা খুসি হয় করো, আমি আর তোমার কোন-কিছুতে থাক্‌বো না।'

রমলা অপরাধীর কণ্ঠে বল্‌লে, 'আমি ত কিছু জানিনা মা।'

'চোখ থাক্‌লে ত জান্‌বে? কচি খুকি! বয়স কি তোমার কম হয়েছে রমলা? সবই চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে দিতে হ'বে?'

রমলা যেন কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না, নির্ব্বোধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো।

হেমলতা তাকে ধমক দিয়ে বল্‌লেন, 'সরে' যাও এখান থেকে। নিজের ভাল নিজে বুঝ্‌তে না পারো আমি আর কি করবো।'

হেমলতা বিছানায় শুয়ে ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন। এতক্ষণে তাঁর মনে হলো সমস্ত দিনের পরিশ্রম তাঁর পণ্ডশ্রম হয়েছে। যে-সম্ভাবনাকে তিনি আঁকড়ে ধরে' আছেন, রমলার বুদ্ধিহীনতায় হয়ত তা ব্যর্থ হবে। হেমলতা মনে-মনে শঙ্কিত হ'লেন।

ক্রমশঃ

সম্পাদকীয়

জার্ম্মানীর হাল-চাল

প্রায় পাঁচ মাস হ'ল য়ুরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। এই যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতিতে নাকি আর তেম্‌নি উত্তেজনা নেই, অন্তত সম্প্রতি ত 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব—এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে অনেক রাষ্ট্র-ধুরন্ধর বলছেন, জার্ম্মানীর সমর-নায়কগণের মধ্যে রীতিমতো মতো-ভেদ এবং তার উপর জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলই নাকি এর প্রধান কারণ। এ-বিষয়ে চূড়ান্ত মত প্রকাশ করেছেন আমেরিকার একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। রয়টারের মারফৎ ইনি জগতবাসীকে জানিয়েছেন: জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সম্প্রতি এতই চরমে উঠেছে যে সেখানে আজ জন-সংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর জন হিটলার-প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রিক নীতি ও নিয়মের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে; আর, শতকরা পঁচানব্বই জন বর্ত্তমান যুদ্ধের বিরুদ্ধে। আমেরিকার এই সাংবাদিকটির কথায় মনে হয়, হিটলারের পতন আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী।

এই সংবাদ সত্য হ'লে হয়তো আমাদের ঠোঁটের ঈশাণ কোণে একটু হাসি ফুটে উঠতো; কিন্তু দুশ্চিন্তার কথা এই, বৃটিশ মন্ত্রি-সভা আমেরিকান সাংবাদিকের কথায় নিশ্চিন্ত হওয়া দূরে থাকুক, এতটুকুও আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। বরং মন্ত্রি-সভার একাধিক সদস্য সম্প্রতি কয়েকটি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এই মর্ম্মে সাবধান-বাণী ঘোষণা করেছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানীর এই সাময়িক শৈথিল্য মারাত্মক আক্রমণের পূর্ব্বাভাষ মাত্র,—হিটলারের হাতে যে অমিত বিক্রম সঞ্চিত আছে তার সাক্ষাৎ মিলবে বর্ত্তমান যুদ্ধের অনিবার্য্য আসন্ন প্রচণ্ডতায়। প্রকৃত পক্ষে, শত্রুপক্ষ এখন তাদের গুপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রে সবেগে শান্ দিচ্ছে।

এদিকে, 'টাইম্‌স' পত্রিকার বেলগ্রেডস্থ এক সাংবাদ-দাতা জানিয়েছেন যে, জার্ম্মান-বাহিনী সম্ভবত শীঘ্রই সোভিয়েট রাশিয়ার অধিকৃত পোল্যাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করবে। এই সংবাদ সত্যে পরিণত হ'লে সমগ্র য়ুরোপের পক্ষে দুশ্চিন্তার কথা। কারণ, রাশিয়ার অধিকৃত পোল্যাণ্ডের এলাকায় প্রবেশ করা মানেই জার্ম্মানীর ইচ্ছাকৃতভাবে রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের স্বর্ণসূত্র ছিন্ন করা। এবং তার উপর যদি বল্কানে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তা'হলে ত এক রকম রাতারাতিই সমগ্র য়ুরোপীয় যুদ্ধের গতির আমূল পরিবর্ত্তন হ'তে বাধ্য! এবং সেই জটিল পরিস্থিতিতেও সকলের সশঙ্ক দৃষ্টি থাকবে হিটলারের উপর—অর্থাৎ জার্ম্মানীর উপর।

কিন্তু আমেরিকান সাংবাদিকটির কথা মনে হ'লে জার্ম্মানীর অস্তিত্বের কথাই আর মগজে আসে না। কারণ, জার্ম্মানীর অন্ত-বিদ্রোহ সম্বন্ধে তিনি এত স্পষ্ট ঘোষণা কোরেছেন যে তা'তে ব্রিটিশ মন্ত্রি-সভা নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটি উৎসবের আয়োজন করতে পারেন। আমরা ভাবছি, শতকরা পঁচানব্বই জন বিদ্রোহী-দেশবাসীর হাত এড়িয়ে বেচারা হিটলার প্রাণে বেঁচে আছে ত?

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও ইটালী

শক্তিশালী য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইটালী আজও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে' আছে। আর বেশি দিন সসম্ভ্রমে নিরপেক্ষ থাকা চলবে কিনা জানি না, তবে সম্প্রতি নীরবতা ত্যাগ করে' জার্ম্মানীর সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান ব্যাপারে ইটালী বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মান ও সোভিয়েট বাহিনী যেভাবে সমবেত হ'তে সুরু করেছে তাতে রুমানিয়ার উপর রাশিয়া ও জার্ম্মানীর যুক্ত আক্রমণ অনিবার্য্য বলে' মনে হচ্ছে। সুতরাং ইটালী ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে যে, বল্কান-অঞ্চল আক্রান্ত হ'লে তার পক্ষে নিরপেক্ষভাবে আর নীরব হ'য়ে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং পূর্ব্ব য়ুরোপে কম্যুনিষ্ট-প্রতিপত্তি সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।

এই প্রসঙ্গে সিনর গ্যায়দা 'Sunday Despatch' নামক পত্রিকায় বলেছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপে কম্যুনিজম বা বলশেভিকবাদ যাতে কোনোওরকমে প্রাধান্য লাভ করতে না পারে তার জন্য ইটালী আন্তরিক ভাবে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে' বাধা দেবে। সুতরাং সহজেই ধারণা করা যায় যে মুসোলিনীও হিটলারের মতো প্রতি মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড অভিযানের পথ-তৈরিতে ব্যাপৃত আছেন।

ইতিমধ্যে গত বাইশে জানুয়ারী তারিখে লণ্ডন থেকে রয়টার সংবাদ দিয়েছে যে, ইটালী ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে সোভিয়েট বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে পাঁচহাজার স্বেচ্ছাসৈন্য পাঠিয়েছে। এই ইটালীয় বাহিনী আপাততঃ হেলসিঙ্কিতে গিয়ে পৌঁছুবে এবং তারপর সেখান থেকে সোভিয়েট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রসর হবে।—যদি এই সংবাদ সত্য হয়, এবং বল্কানে যুদ্ধ বাধে তাহ'লে অবিলম্বে আমরা হিটলার ও মুসোলিনীকে বোমা-বারুদের পারস্পরিক প্রত্যুত্তরের দীর্ঘ দিনের মিতালীর নূতন ভূমিকায় দেখতে পাবো।

ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়া

সোভিয়েট রাষ্ট্রের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যেরূপ ধারণা পাওয়া গিয়েছিলো, কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তার প্রায় দশ আনাই মিথ্যে-বিজ্ঞাপনের বাহুল্যের মতোই; শাসন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের অভাবে তার অমিত সৈন্য-শক্তি একরকম অকর্ম্মণ্য বললেই হয়—ইত্যাদি,—প্রায়ই কয়েকখানি দৈনিকপত্রে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হ'তে দেখে বেশ একটু কৌতূহল অনুভব করেছিলাম।

আবার, সম্প্রতি মণি-মাণিক্য স্থানীয় আমাদের ভারতীয় নেতাদের বিশিষ্ট একজনকে রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির উপর খড়্গ হস্ত হতে দেখে এই কৌতূহলের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। রুশ-জার্ম্মানীর বন্ধুত্বের সূত্র কি কি কারণে 'স্বর্ণসূত্র' তা এঁদের কাছে সহজেই বোধগম্য, বাল্টিক রাজ্যসমূহের সম্বন্ধে রাশিয়ার অবলম্বিত নীতিকেও এঁরা কিছুটা যুক্তিপূর্ণ বলে' মেনে নিতে রাজী —কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারে তাকে ত আর সমর্থন করা যায়ই না, সহ্য করাও মানব-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। বস্তুত, সোভিয়েট রাশিয়া তার বর্ত্তমান পররাষ্ট্রনীতি দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়ে ধনতন্ত্রবাদের বিষ-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছে।

পরাধীন ভারতবাসীর পোল্যাণ্ড ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করা ও তাঁদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে এই ভেবে যে, বিজ্ঞ চিকিৎসকরা পীড়িত রাশিয়ার প্রতি হঠাৎ এতটা বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠলেন কেন। য়ুরোপের দানতান্ত্রিক শক্তিগুলি আজ একযোগে রাশিয়াকে নিশ্চিহ্ন করবার প্রতিজ্ঞায় প্রতি মুহূর্ত্তেই মারাত্মক কার্য্য-ক্রমের পরিকল্পনায় মগ্ন—এ-কথা কি এঁরা হঠাৎ বিস্মৃত হ'লেন? রাষ্ট্রনীতির অতি সূক্ষ্ম কষ্টিপাথরে যাচাই করে' দেখলে বোঝা যাবে, সোভিয়েট রাশিয়া তার আদর্শ ও নীতিকে বলি দেয় নি—সসম্ভ্রমে অস্তিত্ব অটুট রাখবার জন্য বর্ত্তমান নীতি ও কৌশলের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তার পক্ষে গত্যন্তর ছিল না।

তারপর ফিন্‌ল্যাণ্ডের কথাই না হয় ধরা যাক্! বর্ত্তমানে ফিন্‌ল্যাণ্ডে যারা তথাকথিত স্বাধীনতা রক্ষার নামে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, তারা ফিন্‌ল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি ত নয়ই, বরং কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দলের চক্রান্ত ও শক্তির দ্বারা সমর্থিত। ফ্যাসিষ্ট্‌দের ভলান্টীয়ার দল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করে' যে-কৌশলে স্পেন থেকে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধন করেছিলো, সম্প্রতি ফিন্‌ল্যাণ্ডে সেই একই চক্রান্ত নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-সমষ্টি অতি কূট অভিনয়ের অবতারণা করেছে।

সুতরাং, ভূমিকা-পর্ব্বের উত্তেজনায় যাঁরা সোভিয়েট রাশিয়াকে ঘটি-বাটী সমেত নীলামে তুলে দিচ্ছেন বা তার বর্ত্তমান কৌশলকে সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ বলে' প্রচার করতে উৎসাহ পান, তাঁদের এই ধরণের বিচক্ষণ ক্রিয়া-কলাপে আমাদের কৌতূহলও যেমন হয়, সন্দেহও হয় তেম্‌নি তার দ্বিগুণ।

গান্ধীজীর আপোষ-মীমাংসা

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হ'য়ে গেল, তা' থেকে আমরা আর-কিছু না হোক্ এটা অন্তত আশা করতে পারি যে, অবিলম্বে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা ঘরোয়া মিটমাট অনিবার্য্য—অর্থাৎ কিনা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বেকারত্ব ঘুচবে এবং তাঁরা আবার নিজের-নিজের পরিত্যক্ত গদীতে কায়েমী হ'য়ে বস্‌বেন।

স্বয়ং গান্ধীজী বড়লাটের বোম্বাই-বক্তৃতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 'বড়লাটের সর্ব্বশেষ ঘোষণাটি আমার ভালই লেগেছে। আমি তাঁর আন্তরিকতায় সত্যিই বিশ্বাস করি।' এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি আপোষ-আলোচনা চালাবার জন্যে কংগ্রেসের তরফ থেকে শীঘ্রই দিল্লীতে যাত্রা করছেন। প্রকাশ, ঐ সময় জিন্না ও অন্যান্য দলের নেতারাও দিল্লীতে উপস্থিত থাকবেন।

অতএব আর একটি ভারতীয় গোল-টেবিল বৈঠক! এই বৈঠকের ফলাফল স্বরূপ আমরা অবিলম্বে দেখতে পাবো, কংগ্রেসী-মন্ত্রীরা প্রদেশে-প্রদেশে স্থির শান্ত হয়ে নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কাজ চালাতে সুরু করেছেন—আর গভর্ণমেণ্ট মাঝে-মাঝে তাঁদের পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে বলছেন, 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন দেওয়া সম্পর্কে আমরা সর্ব্বদাই আন্তরিকভাবে বিবেচনা করছি।'

আপোষ-আলোচনার এই সব উদ্যোগ-আয়োজন দেখে কে অস্বীকার করবে, ভারতের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন গান্ধীজী ও বড়লাটের আন্তরিকতার উপর অবশ্যই নির্ভর করে। কিন্তু মুস্কিল এখানে নয়। গান্ধীজী লর্ড লিনলিথ্‌গোর বক্তৃতার মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির যে সূক্ষ্ম-বীজের সন্ধান পেয়েছেন, তা'কে পণ্ডিত জওহরলাল বলছেন, 'এই সূক্ষ্ম-বীজটি বাইরে থেকে দেখতে বেশ সুন্দর বটে, তবে এর পরিণাম সেই মাকাল ফলে! বর্ত্তমান ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার নিকট থেকে ভারতবাসীর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন-লাভের কোনো আশাই নেই।' গান্ধীজী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা করে' প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা পুনরায় সচল করতে রাজী হয়েছেন বটে, কিন্তু জওহরলাল, বিহারের সমাজ-তন্ত্রীদল প্রভৃতি কেউ এতে রাজী নন্।

বড়োই আফশোষের কথা, জওহরলাল মাঝে-মাঝে বেফাঁস কথা বলে' ফেলবার বদঅভ্যাস এখনও ত্যাগ করতে পারেন নি। আশা করা যায়, তাঁর মুখও অতি সহজে বন্ধ হবে।

তবে, লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে গান্ধীজীর আপোষ-আলোচনা যদি কোন কারণে ব্যর্থও হয়, আমাদের তাতে কোনো নৈরাশ্যের কারণ থাকবে না। যেহেতু, গান্ধীজীর আদর্শ-মূলক নিষ্ঠার উপর দেশবাসীর এখনও অগাধ শ্রদ্ধা—তিনি সম্প্রতি আশ্বাস দিয়েছেন, নতুন করে' আবার মারাত্মক সংগ্রামের উপায় তাঁর মাথায় এসেছে। এবং সে-সংগ্রামের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'চরকা'—একমাত্র চরকা।

রামগড় কংগ্রেস

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সম্প্রতি স্থির করেছেন যে রামগড় কংগ্রেসে আগামী ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই মার্চ্চ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে মার্চ্চ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ও বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন এবং ১৯শে, ২০শে ও ২১শে মার্চ্চ কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

রামগড় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মনোনয়নের শেষ তারিখ নির্দ্ধারিত হয়েছে। আন্দাজ করা যাচ্ছে যে, কংগ্রেসের সরকারী প্রার্থী হিসাবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদকেই সভাপতি দাঁড় করানো হবে।

মৌলানা আজাদ পোষমানা বিড়ালের মতো সব সময়ই কংগ্রেসের হাতে-পায়ে জড়িয়ে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কে কি বলবে?

ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু মহাসভা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্ব্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করাবেন বলে' সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রার্থী মনোনয়ন সম্পর্কে হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি একটি সাব-কমিটি গঠন করেছেন। এই সাব-কমিটিতে সদস্যরূপে নিযুক্ত হয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নিশ্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও বি, সি, চট্টোপাধ্যায়। প্রার্থী মনোনয়ন-ব্যাপারে এই সাব-কমিটির হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

ওয়ার্কিং কমিটি ও বাঙলা কংগ্রেস

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু গত ২০শে জানুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে আড়াই ঘণ্টা ধরে' বাঙলা কংগ্রেসের বক্তব্য বুঝিয়ে বলেন। তাঁর এই বিস্তারিত বিবৃতিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির গণ্ডগোলের মূল কারণগুলি স্পষ্ট করে' দেখানো হয়েছে এবং বাঙলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যে নিতান্তই ভ্রান্ত-ধারণা প্রসূত ও দলগত তা'-ও প্রতিপন্ন হয়েছে।

আসল কথা এই যে, যাঁরা উদ্যোগী হয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, তাঁরা বেশ সুকৌশলে মূল তথ্যগুলি চেপে গিয়েছেন। আরো লজ্জার কথা এই, ওয়ার্কিং কমিটিতে বর্ত্তমানে বাঙলা দেশের যে দু'জন প্রতিনিধি আছেন তাঁরাও এ-সব কথা কমিটির গোচরে আনা প্রয়োজন বিবেচনা করেন নি।

কিন্তু আসল কাঁটাটি কোথায় বিঁধে আছে, তা' বোধকরি, জনসাধারণের আজ আর অজানা নেই। ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা সুভাষচন্দ্র দণ্ডিত ও বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও বাঙলা কংগ্রেস এখনও তাঁরই নির্দ্দেশ অনুসারে চলছে এবং তাঁকে মাথায় করে' নাচছে—এ কি কম ক্ষোভের কথা!

সত্যি কথা। বাঙলা দেশে আজো সুভাষচন্দ্রের দুলালপনা এবং তার জন্য শরৎ বসুর নির্লজ্জ ওকালতি—একেবারেই অসহ্য! কিন্তু নির্লজ্জ শরৎ বসুর ভাষাতেই বিধানচন্দ্র রায় ও কিরণশঙ্কর রায়ের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন, তাঁরা অন্ততঃ এমন একজনের নাম করুন, যাঁকে বাঙলার জনসাধারণ দ্বিধাশূন্য মনে সুভাষচন্দ্রের পরিবর্ত্তে একমাত্র নায়ক বলে' গ্রহণ করবে।

সম্পাদক : বিরাম মুখোপাধ্যায়

১৩নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড হইতে প্রকাশিত ও ৭১।১, পটুয়াটোলা লেনের 'ইওর প্রেস' হইতে মুদ্রিত। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : বিরাম মুখোপাধ্যায়